জেন আয়ার
B. Roy

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

অনুবাদ সিরিজ

জেন আয়ার

(শার্লোট ব্রন্টি)

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অনুদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

JEN AYAR
CODE NO. 4-29-131

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

জুলাই
১৯৮৬
৫

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ৮·০০

উপহার

লেখক-পরিচিতি

(শার্লোট ব্রণ্ট)

অনেক বই না লিখেও যাঁরা বিশ্বসাহিত্যে মর্যাদার আসন অধিকার করেছেন, শার্লোট ব্রণ্ট তাঁদেরই একজন।

ইয়র্কশায়ারের এক গণ্ডগ্রাম—হাওর্থ—সেইখানে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে শার্লোটের জন্ম। পিতা ছিলেন সাধারণ এক ধর্মযাজক, দারিদ্র্যেই দিন কেটেছিল শার্লোটের শৈশবে। ভাল স্কুলে কোনদিন পড়তে পান নি, তবু নিজের শিক্ষা নিজের যত্নেই সুসম্পূর্ণ করে তুলেছিলেন।

শার্লোট এবং তাঁর ছোট দুই বোন এমিলি ও এ্যান—তিনজনে মিলে ছেলেবেলাতেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী, রূপকথা, কবিতা—কিছু তাঁরা বাদ দেন নি। এরই ফলে পরবর্তী জীবনে তিন বোনই সাহিত্যিকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিলেন।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'জেন আয়ার' প্রকাশিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক-সমাজে অভূতপূর্ব সমাদর লাভ করে। শার্লোট নিজনামে ছাপেন নি বই, প্রথম দুটি সংস্করণ "কুরার বেল" ছদ্মনামে মুদ্রিত হয়েছিল। বহুদিন পর্যন্ত লোকে জানতে পারে নি যে কুরার বেল কে, সে নারী না পুরুষ।

যশস্বী সাহিত্যসমালোচক জোয়াড বলেছিলেন—"A book is great when it ceases to matter that it is bad" অর্থাৎ বই ত্রুটিবিচ্যুতিপূর্ণ হলেও যদি জনপ্রিয় হয়, তবে বুঝতে হবে সে বই মহৎ সাহিত্য। জেন আয়ার উপন্যাসখানিতে ত্রুটি আছে অনেক, তবু শতাধিক বৎসর ধরে পাঠকেরা পুরুষানুক্রমে একে ভালবেসে আসছে। তাতেই প্রমাণ হয়েছে যে জেন আয়ার কালোত্তীর্ণ সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে।

শার্লোট ব্রণ্টির অন্যান্য গ্রন্থ—উদারিং হাইট্‌স্‌, এ্যাগনেস্‌ গ্রে, শার্লি, ভিলেট—সবই জনপ্রিয় হয়েছিল। যে জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল দুঃখ ও দারিদ্র্যে, তার সমাপ্তি ঘটল ঐশ্বর্য ও পরিপূর্ণ গৌরবে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে শার্লোট ব্রন্টির মৃত্যু হয়।

একখানা আরাম কেদারায় আরাম করেই বসেছে

জেন আয়ার

এক

সেদিন আর বাইরে বেড়াবার কোন উপায় ছিল না।

সকালবেলায় অবশ্য বাগানে ঘণ্টাখানিক ঘুরেছিলাম, কিন্তু সান্ধ্য ভোজনের পরই শীতের কনকনে হাওয়ায় ভর করে, এমন জমাট মেঘ এসে আকাশ ছেয়ে ফেলল, আর তা থেকে অবিরল ঝরতে লাগল গায়ে-বিঁধে-যাওয়া এমন তীরের ফলার মত বৃষ্টি যে ঘর থেকে বেরুবার কোন উপায়ই আর রইল না।

ভালই হল। শীতের বিকালে দূর পথে বেড়াতে যাওয়া আমার কোন দিনই পছন্দ নয়। উঃ, ফেরার সময় সে কী কষ্ট! হাতের পায়ের সবগুলো আঙ্গুল ঠাণ্ডায় অসাড়, ধাই বেসীর মুখ থেকে বকুনির খই ফুটছে, আর এলিজা, জন আর জর্জিয়ানা রীড আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে দৌড়-ঝাঁপ করছে, ঠিক যেন আমার দুর্বল দেহকে উপহাস করবার জন্যই।

যাক সে কথা। এলিজা, জন, জর্জিয়ানারা এখন তাদের মায়ের চারদিকে জটলা করছে বসবার ঘরে। ভদ্রমহিলা আগুনের ধারে সোফায় কাত হয়ে বসে রয়েছেন, আদুরে বাছারা কেউ এখন ঝগড়াও করছে না, কাঁদছেও না, রীড-গিন্নীর মুখ চোখ থেকে আনন্দ উপচে পড়ছে।

আমার স্থান নেই ওখানে। গিন্নী নিষেধ করে দিয়েছেন স্পষ্ট ভাষায়। "বেসী যখন বলবে, নিজের চোখে আমি যখন দেখব যে তুমি—ছেলেমানুষের যেমন হওয়া উচিত—তেমনি মনখোলা মিশুক মেজাজের পরিচয় দিচ্ছ, তখনই আমার এই সোনার চাঁদদের সঙ্গে মিশতে পারবে তুমি। যে মন খুলে হাসতে জানে না, মনে মনে যার জিলিপির প্যাঁচ, যার ভাবভঙ্গী দেখলে লোকের বিতৃষ্ণা জন্মায়, তাকে আমি আমার বাছাদের ত্রিসীমায় ঘেঁষতে দিতে পারি না।"

"বেসী কী বলেছে? কী করেছি আমি?"—জিজ্ঞাসা করি কান্না চেপে।

"জেন, অত প্রশ্ন যারা করে, পরের নিন্দা যারা করে, বড়দের দোষত্রুটি যারা খুঁজে বেড়ায়, তাদের কেউ পছন্দ করে না। যেখানে হয় এক জায়গায় গিয়ে বসে থাকো, আর ভাল কথা যখন তুমি বলতে জানোই না, তখন চুপ করে থাকো।"

বসবার ঘরের গায়েই একখানা ছোট ঘর, সেখানে কখনো কখনো প্রাতরাশ খাওয়া হয়। আমি সেই ঘরে ঢুকে পড়লাম। একটা আলমারিতে কিছু বই রয়েছে এখানে, একখানা বই হাতে নিলাম, প্রচুর ছবি যাতে। জানালার উপর উঠে বসলাম, তারপর পা গুটিয়ে তুলে পর্দাটা ভাল করে টেনে দিলাম নিজেকে আড়াল করে।

বেশ নিরালা আশ্রয়টুকু। ডাইনে ভাঁজে ভাঁজে লাল পর্দা, বাঁয়ে কাচের জানালার উপরে বাদলের অবিরল ঝাপটা। যতদূর দৃষ্টি চলে—মেঘ আর কুয়াশায় সারা পৃথিবী ধোঁয়াটে, অস্পষ্ট। তাকে মথিত করে ফিরছে ঝড়ো হাওয়ার একটানা হাহাধ্বনি।

বইখানার পাতায় পাতায় ছবি। ছবিতে মশগুল হয়ে আমি দুঃখ বেদনা নৈরাশ্য সব ভুলেছি। এক ভয় শুধু এখন—ওরা কেউ এসে যদি আমার এ আনন্দে ব্যাঘাত ঘটায়।

সে-ব্যাঘাত অচিরেই এল। ঘরের দরজা খুলে চেঁচিয়ে উঠল জন রীড—"কই রে ঘরকুনী বুড়ী?"

তারপরই সে অবাক্ হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। আমাকে দেখতে পায়নি। খালি ঘর।

"কোন্ চুলোয় গেল সেটা? লিজি! জর্জি! জেন নেই এখানে। এই বিষ্টিতে বেরিয়ে পড়েছে, জানোয়ার কোথাকার!" মনে মনে ভাবছি—পর্দাটা টেনে দিয়ে ভাল হয়েছে। আমায় দেখতে না পেয়ে বাঁদরটা চলে যায় যদি, বেঁচে যাই এখনকার মত।

দেখতে ও পেতও না। চোখে একটু কমই দেখে ও। কিন্তু এলিজার দৃষ্টি ধারালো, সে এ-ঘরে মুখ বাড়িয়ে বলে উঠল—"আরে ঐ তো সে জানালায় বসে আছে।"

আমায় নেমে আসতেই হল। না এলে টেনে নামাবে জন। বইখানা জানালাতে রেখে আস্তে আস্তে নেমে এলাম—"কী বলছ?"

"বলছি এখানে আসতে।"—বলে সে চেয়ারে চেপে বসল বিচারকের ভঙ্গী নিয়ে। হাত নেড়ে ডাকল আমাকে তার সমুখে এসে দাঁড়াবার জন্য।

বয়স ওর চৌদ্দ বছর, চার বছরের বড় আমার চেয়ে। স্কুলে পড়ে। বয়সের আন্দাজে অতিরিক্ত লম্বা চওড়া, হাত পা গোদা গোদা, নাক কান সবই বড় বড়। খেতে বসলেই গাণ্ডেপিণ্ডে খায়, তারই দরুন ফুলো ফুলো গাল আর জোলো-জোলো চোখ।

এখন ওর স্কুলে থাকবার কথা। কিন্তু ওর "স্বাস্থ্য ভাল নয়" বলে ওর মা দুই এক মাসের জন্য ওকে বাড়িতে এনে রেখেছেন। মাস্টার-মশাই, মাইলস তাঁর নাম, বলেছিলেন, "বাড়ি থেকে অত কেক আর মিষ্টি ওকে পাঠাবেন না, তাহলেই ওর স্বাস্থ্য ভাল হয়ে উঠবে।" কিন্তু মায়ের প্রাণ কি এমন নিষ্ঠুর মন্তব্যে সায় দিতে পারে? তিনি ভাবলেন মাস্টারটা এসব কী বোঝে? আসলে পড়াশুনার বেদম চাপ, তার উপরে বাড়ির জন্য মন-কেমন-করা, এই দুই কারণেই শরীর ওর এত খারাপ।

মায়ের উপর, বোনেদের উপর এমন কিছু স্নেহশীল নয় জন। আর আমি তো তার দু'চক্ষের বিষ। অনবরত ধমকাচ্ছে আমাকে, নিত্য নূতন সাজা দিচ্ছে। হপ্তায় দু'বার তিনবার? অথবা দিনে দু'বার একবার? মোটেই না। প্রতিনিয়ত। চব্বিশ ঘণ্টা। ফলে এখন এই রকম দাঁড়িয়েছে যে ও ডাকলে আমার বুকের ভিতর হিম হয়ে যায় এখন, গায়ের হাড়-মাস কুঁকড়ে ভিতরে ঢুকতে চায় মারের ভয়ে। বিভীষিকায় আমি আড়ষ্ট হয়ে আছি সারাক্ষণ, কারণ ও আমায় মারলে আর কোন আপীল নেই। চাকরেরা আমার পক্ষ নিয়ে মনিবের বিষনজরে পড়বে? সেটা প্রত্যাশা করাই অন্যায়। আর ওর মা? জন তো আমাকে মারলে ওর মা তা চোখেই দেখতে পান না। যদিও যখন তখন তাঁর চোখের সামনেই সে মারছে আমাকে।

ওর হুকুম তামিল করাই আমার অভ্যাস, আমি হুকুম শুনেই ওর চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়ালাম। তিন মিনিট ও কাটিয়ে দিল আমাকে মুখ ভেংচে। এমনভাবে জিভ বার করতে লাগল যে জিভের মূলসুদ্ধ উপড়ে আসার যোগাড়। এর পরই যে মারতে শুরু করবে তাতে

সন্দেহমাত্রই নেই আমার। ভয়ে কাঁপছি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকিয়ে তাকিয়ে ওকে না দেখেও পারছি না। কী বিশ্রী দেখাচ্ছে ওকে! একটা বিজাতীয় বিতৃষ্ণা অমন যে সাংঘাতিক ভয় তাকেও বুঝি ছাপিয়ে উঠল।

ছেলেটা বুঝি বা সে বিতৃষ্ণার আভাস দেখতে পেল আমার মুখে। তাই রাগের মাথায় রীতিবিরুদ্ধ কাজ করে বসল। সাধারণতঃ প্রহারের আগে একটা তর্জনগর্জনের ভূমিকা থাকে ওর। আজ সেটা টপকে গিয়ে আচমকাই মেরে বসল। রীতিমত জোরেই মারল। আমি টাল খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলাম। অতি কষ্টে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই পা পিছিয়ে গেলাম ওর চেয়ার থেকে।

"মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটির যে বেয়াদপি, তারই সাজা ওটা।" তারপরই একটু ভেবে নিয়ে নতুন নতুন অভিযোগের ফিরিস্তি—"ওভাবে লুকিয়েছিলি কেন জানালার আড়ালে? ওভাবে তাকাচ্ছিলি কেন, আমার দিকে? ইঁদুরের মত? এই ইঁদুর! কেন তাকাচ্ছিলি ওভাবে?"

এর পরই আবার মার শুরু হবে জানি। আমি সেইটির জন্যই তৈরী হচ্ছি। কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বা সার্থকতা কিছু নেই, সে চেষ্টাও করছি না।

"কী করছিলি পর্দার আড়ালে?"—জিজ্ঞাসা করে জন।

"পড়ছিলাম—"

"দেখি কী পড়ছিলি!"

জানালা থেকে বইখানা এনে দিলাম।

সে সেটা হাতে নিয়ে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। "তুই আমাদের বই পড়বি কেন? মা বলেছে, তুই আমাদের গলগ্রহ। তোর বাবা তোর জন্য একটি পেনিও রেখে যায় নি। তোর উচিত ভিক্ষে করে বেড়ানো। তোর আবার পড়াশোনা কেন?"

মনে মনে হাজারটা জবাব ভিড় করে আসে, কিন্তু মুখে তা উচ্চারণ করি না।

"ঐ দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়া, আমার দিকে পিছন করে"—হুকুম আসে মালিকের। আদেশটা নতুন রকমের। পালন করি, তারপর আমি সন্দিগ্ধভাবে পিছন ফিরে তাকাই—নিশ্চয়ই একটা কিছু শয়তানী মতলব ওর মাথায় আছে।

যা ভেবেছি, তাই বটে। সেই মোটা বইখানা তুলে সে আমার মাথার দিকে তাক করছে। আমি তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু দেরি হয়ে গিয়েছে। মোটা বইখানা বোঁ করে ছুটে এসে মাথায় লাগল আমার। টাল খেয়ে পড়ে গেলাম ঠিক দরজার উপরে। মাথায় কোথায় যেন কেটে গেল। আমি উঠবার চেষ্টা করতে করতে ককিয়ে উঠলাম—"কেন মারলে? কী করেছি আমি?"

"কী করেছিস, তাই আবার জিজ্ঞাসা? বেয়াদপ ভিখিরী!" চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে এল জন হাত মুঠি করে। আমি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছি। মাথার ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে গলা বেয়ে, গাল বেয়ে। একবিন্দু রক্তের নোনতা আস্বাদ লাগল আমার ঠোঁটে। রক্তের স্বাদে না কি খুন চাপে মানুষের মাথায়। আমার যে চাপল, তাতে ভুল নেই। ভয়ডর ঘুচে গিয়ে একটা দুর্জয় ক্রোধ চেপে বসল অন্তরে। সেই ক্রোধের বশে আমি যে কী করে বসলাম, তা জানি না। জন এসে আমাকে এক কিল বসিয়ে দিতেই আমি তাকে চেপে ধরলাম। তার চেয়ে মাথায় এক ফুট খাটো আমি, সে আমাকে ইচ্ছে করলে দু'টুকরো করে ভেঙে ফেলতে পারে, সে কথা মনেই রইল না আমার। কী যে আমি করলাম, তা জানি না, কিন্তু অত বড় মুস্কো জোয়ান জন ছেলেটা পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠল—"বাপ্‌রে, মা-রে, মেরে ফেলেছে রে! একেবারে মেরে ফেলেছে আমাকে।"

দুপদাপ ধুপধাপ! চারদিক থেকে লোক দৌড়ে আসছে। গেট্‌স্‌-হেড-লজ-এর ভবিষ্যৎ মালিককে কে মেরে ফেলল—দেখবার জন্য সবাই ছুটে আসছে "কী হল কী হল" আওয়াজ তুলে। এলেন জনের মা মিসেস্‌ রীড, এল জনের দুই বোন এলিজা জর্জিয়ানা, এল ধাই বেসী, এল ঘর-করুনী মিসেস্‌ অ্যাবট, চাকর চাকরানী বাড়িতে যতগুলি ছিল বাকী রইল না কেউ।

"কী হয়েছে?" ক্রুদ্ধ জলদগম্ভীর গর্জন মিসেস্‌ রীডের।

"আমায় খামচে খুন করে ফেলেছে।" জনের আর্তনাদ—"নখ তো নয়, যেন ইঁদুরের দাঁত।"

"আ-হা-হা!" সমস্বরে সমবেদনা সমবেত নরনারীর।

"কী রাক্ষসী !"—বলে একজন।

"বাঘিনী, বাঘিনী !"—পোঁ ধরে আর একজন।

দেখতে দেখতে হিঁচড়ে টেনে আমাকে ওরা সরিয়ে নিয়ে এল জন-এর কাছ থেকে। তখনও আমার মুখে আর গলায় রক্তের ধারা, সেদিকে কেউ ফিরেও তাকাল না, জন-এর গায়ে কোথায় নখের আঁচড় লেগেছে কি না লেগেছে, তারই শুশ্রূষায় লেগে গেল একডজন লোক। তাকে ধরাধরি করে নিয়ে সোফায় শুইয়ে দিতে গেল ওরা, এদিকে মিসেস্ রীডের রক্তচক্ষুর দৃষ্টি আমাকে যেন পুড়িয়ে ফেলতে চাইছে একেবারে। অনর্গল অভি-সম্পাতের স্রোত বইছে তাঁর মুখ থেকে—"এমন বর্বর, এমন অকৃতজ্ঞ, এত হিংস্র কোন শিশু যে হতে পারে, এ না দেখলে কে বিশ্বাস করবে? যার খেয়ে মানুষ, তাকেই নির্বংশ করার ফিকির ?"

আমি একবার ক্ষীণকণ্ঠে বলতে যাচ্ছিলাম—"জন আমার মাথায় বই ছুড়ে মেরেছিল। পড়ে গিয়ে দরজায় মাথা কেটে—"

হুংকার করে উঠলেন মিসেস্ রীড—"নিয়ে যাও ওকে, বন্ধ কর লাল কামরায়। আমি নিজে এসে যতক্ষণ না দরজা খুলে দিচ্ছি, কেউ যেন ওর কাছে না যায়।"

বলেই মিসেস্ রীড তাঁর আদরের দুলালের তদারক করবার জন্য ছুটলেন। বেসী আর মিসেস্ অ্যাবট এসে ধরল আমাকে, টেনে নিয়ে ঢোকাল লাল কামরায়। সে-ঘরে ভয় আছে বলেই জানি আমরা, সেখানে একা থাকবার কল্পনায় আমার বুকের ভিতরটা হিম হয়ে এল। আমি আছাড়ি-বিছাড়ি করতে লাগলাম, কিছুতেই যাব না লাল কামরায়। কিন্তু পারব কেন ওদের সঙ্গে জোরে। টেনে নিয়ে একটা সোফায় আমাকে ফেলে দিল ওরা। ছেড়ে দিলেই পাছে আমি উঠে পালাই, এই ভয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধবার চেষ্টা করতে লাগল আমাকে।

আমি হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম—"আমাকে বাঁধতে হবে না, আমি নড়ব না এখান থেকে। দোহাই তোমাদের, আমায় বেঁধো না, বেঁধো না।"

"বেশ, বাঁধছি না। ঠাণ্ডা হয়ে থাক, যদি ভাল চাও"—বলে ওরা আমায় ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি টলতে টলতে উঠে দরজা পর্যন্ত গেলাম, দরজা টেনে দেখলাম যদি দয়া করে তালা বন্ধ না করে

থাকে। কিন্তু নাঃ, দয়া ওদের কোথায়? আর মিসেস্ রীডের কড়া হুকুমের মুখে দয়া করবার সাহসই বা ওদের থাকবে কোথা থেকে? দরজা সত্যিই তালা বন্ধ।

ফিরে এসে সেই সোফায় পড়ে কাঁদতে লাগলাম। আমার অপরাধ যে কোন্খানে, আমি তা কোনমতেই বুঝতে পারছি না। হাজার অত্যাচার আমার উপর হলেও আমায় হাসিমুখে তা সহ্য করতে হবে, এ-রকম কোন কথা আছে না কি? ওদের আচরণ দেখলে তো তাই মনে হয়। কেন এ অত্যাচার? আমি তো নিজে এসে এদের ঘাড়ে চাপি নি! আমার বাবা-মা মারা গেলেন যখন, তখন আমার বয়স কয়েক মাস মাত্র। এরা আমাকে এখানে এনে না তুললে আমিও হয়ত তক্ষুনি মরে রেহাই পেতাম। কষ্ট পেয়েই মরতাম নিশ্চয়, কিন্তু কষ্ট বুঝবার মত জ্ঞান তখন হয় নি, আর কয়দিনই বা সে কষ্ট সইতে হত? তার তুলনায় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই যে একটানা যম-যন্ত্রণা—এ কি অনেক, অনেক বেশি দুর্বহ নয়? জ্ঞান হয়ে অবধি এমন একটা দিনের কথাও তো আমি মনে করতে পারি না, যেদিন আমাকে মার খেতে হয় নি বা গালিগালাজ শুনতে হয় নি!

কাঁদতে কাঁদতে কান্না একসময় থেমে গিয়েছে। এখন মাঝে মাঝে ফোঁপাচ্ছি ঘাড় গুঁজে। আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছি চারদিকে। সমুখে বড় আয়না একখানা, তাতে দেখতে পেলাম নিজের মূর্তি। গলায় মুখে মোটা হয়ে জমাট বেঁধে আছে রক্তের ধারা, দেখে নিজেরই ভয় করতে লাগল। একে চেহারা আমার ভাল নয়, তায় মাথার চুল উস্কখুস্ক হয়ে ছড়িয়ে আছে, কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলে উঠেছে, জামায় কাপড়ে ঝি-চাকরানীদের নোংরা হাতের টানাটানির দাগ, একটা বীভৎস ছবি আমার সমুখে ফুটে উঠেছে যেন। তাড়াতাড়ি আয়নার দিক্ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

দেখতে লাগলাম ঘরখানা। এ ঘরে আগে কখনও ঢুকিনি, যদিও লাল কামরার নাম শুনে আসছি জ্ঞান হয়ে অবধি। এ ঘরে কেউ থাকে না, নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঢোকে না এ ঘরে। হপ্তায় একবার এক দাসী এসে ঝাড়-পোঁছ করে যায়, আর মাসে দুই একবার মিসেস্ রীড এসে এ-ঘরের লোহার আলমারি খুলে দলিল দস্তাবেজ দেখেন। অন্য সময়ে বন্ধ থাকে এ ঘর।

অথচ বাড়ির ভিতর সবচেয়ে বড় আর সব চেয়ে ভাল ঘর বোধহয় এইখানিই। ঠিক মাঝখানে মেহগনি কাঠের প্রকাণ্ড খাট একখানা, তার চার কোণের চারটি কাঠের খোঁটা যেন চারটি মার্বেল স্তম্ভ। সেই খাটে গদির উপরে গদি, বালিশের উপরে বালিশ, মার্সাইয়ের দুধের মত সাদা চাদর দিয়ে সেই বিছানা ঢাকা, চারদিকে লাল সাটিনের পর্দা দিয়ে ঘেরা। এই বিছানায় শয়ন করতেন এই বাড়ির মালিক মিস্টার রীড, যিনি ছিলেন আমার মামা, বাবা-মা মারা যাওয়ার পরে যে মামা আমাকে কোলে করে এনে তুলেছিলেন তাঁর বাড়িতে।

আমার দুর্গতি শুরু হয়েছে সেই মামা মারা যাওয়ার পরে। ঐ বিছানাতে শুয়েই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। ঐ মেঝেতেই তাঁর মৃতদেহকে কফিনে আবদ্ধ করে ঐ দরজা দিয়েই বাইরে নিয়ে গিয়েছিল শববাহকেরা। তারপর থেকে তাঁর স্থান হয়েছে গেট্সহেড গির্জার সমাধিমন্দিরে মাটির তলায়।

আর সেই থেকেই এ ঘর বন্ধ পড়ে আছে সর্বদা। মিসেস্ রীড এ-ঘরে আসেন না, কাজেই অন্য কেউই আসে না। মিসেস্ রীডের না আসবার কারণ আমি পরবর্তী জীবনে আবিষ্কার করেছিলাম বেসীর কথাবার্তা থেকে। সে কারণ আর কিছু নয় বিবেকের দংশন। মৃত্যুকালে মামা মিসেস্ রীডের হাতে ধরে অনুনয় করে গিয়েছিলেন যাতে তাঁর অবর্তমানে তাঁর অনাথা ভাগিনেয়ীটার কোন অযত্ন না হয়, নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমান যত্নে যেন মিসেস্ রীড তাকে পালন করেন, এই ছিল তাঁর অন্তিম কামনা। মুমূর্ষু স্বামীর শেষ অনুরোধ তখন অগ্রাহ্য করতে পারেন নি ভদ্রমহিলা, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পরেই তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করে তিনি পারেন নি। সেই জন্যই এই কক্ষ, ঐ শয্যা, এই কক্ষের পরিবেশ—এ সব তিনি এড়িয়ে চলতে চান। এখানে এলেই তাঁর মনে হয়—মৃতের ক্ষুব্ধ আত্মা তাঁর দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য।

বড় হয়ে এই সব শুনেছিলাম, বড় হয়ে বুঝেও ছিলাম যে মিসেস্ রীডের মত স্বার্থসর্বস্বা নারীর পক্ষে ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করারও কোন উপায় ছিল না। আমি মিস্টার রীডেরই ভাগিনেয়ী, মিসেস্ রীডের কেউ নই। একটা নিঃসম্পর্কীয়া অনাথা মেয়েকে আদর করা, নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমান যত্নে তাকে পালন করা—এ তিনি নিজের

কর্তব্য বলে মনে করতে পারেন নি। স্বামীর অনুরোধ? ও জাতীয়া রমণীরা জীবিত স্বামীর অনুরোধ বড় মানে, তো মৃত স্বামীর অনুরোধ!

* * *

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। দেয়ালে দেয়ালে লাল পর্দা, মেঝেতে লাল কার্পেট, চেয়ারে টেবিলে সোফায় সর্বত্র বহুমূল্য লাল কাপড়ের ঢাকনা। এই সবের জন্যই ঘরখানার নাম লাল কামরা। বড় বড় জানালা দুটো বন্ধ রয়েছে। হাওয়া ঢুকছে সামান্যই, ছাদের কোলের স্কাইলাইট দিয়ে। অস্তসূর্যের এক এক ফালি রোদ্দুরও এসে পড়ছে এখানে ওখানে। লাল পর্দার উপরে সেই রোদ্দুরের ঝলক ঠিক যেন রক্তের ঢেউ বলে মনে হচ্ছে।

নিস্তব্ধ চারিধার, শোনা যায় শুধু একটানা বাদলের রিমঝিম শব্দ। ঘরের ভিতরে সামান্য যেটুকু আলো ছিল, তা নিভে আসছে ক্রমশঃ। গা ছমছম করছে আমার। রাত্রি আসন্ন, ঘরখানা ভূতুড়ে, বাইরে কোথাও মানুষের সাড়া নেই। আয়নায় আমার নিজের ছায়াকেই মনে হচ্ছে যেন একটা বিদেহী ছায়ামূর্তি বলে। দারুণ ভয় করছে। আয়নার দিকে তাকাচ্ছি না। তবু কেবলই মনে হচ্ছে ঐ বুঝি স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে নেমে আসছে কার লম্বা সরু হাত, ঐ বুঝি ঐ বড় আরাম-কেদারার উপর শুয়ে কে তাকিয়ে আছে আমার দিকে সকরুণ চোখে। গা সিড়সিড় করে উঠল। আমার মামার আত্মা নয় তো? প্রিয়জনের দুঃখের মুহূর্তে স্বর্গতঃ আত্মারা মাটির পৃথিবীতে নেমে আসেন—এমন গল্প আমি শুনেছি। মামা যদি সত্যিই আসেন? তিনি হয়ত ভালবেসেই আসবেন, কিন্তু আমি—আমার যে ভয় করছে! আমি যে তাঁকে দেখলে—

হঠাৎ সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভয়ে আমি ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে। একটা লাল আলো স্কাইলাইট দিয়ে ঢুকে দেয়ালের মাথায় পড়ছে। আলোটা চলে বেড়াচ্ছে! আমি আর বসে থাকতে পারলাম না। লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গিয়ে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলাম। সারা গায়ের জোর দিয়ে ধাক্কা। অনবরত ধাক্কা। দুমদুম শব্দ হতে লাগল। পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম দূরে। দৌড়ে আসছে কারা।

বেসী এসে ঝনাৎ করে তালা খুলে ফেলল—"কী? কী? কী

হয়েছে ?”—আমি উত্তর না দিয়ে তাকে জাপটে ধরলাম, তার কোলের মধ্যে লুকিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। বেসী বোধহয় আমার অবস্থা বুঝল। সে ঠেলে সরিয়ে দিল না আমাকে। বরং আমাকে জড়িয়ে ধরে দরদের সুরেই বলল—“কী ? কী হয়েছে জেন ?”

“ভয় ! কে যেন ঐ ঘরের ভিতর—কী যেন একটা আলো—” আর আমি কথা কইতে পারলাম না। তখনও কাঁপছি আমি। মিসেস্ রীড নেমে এলেন সশব্দে। তাঁকে দেখে বেসী আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল—আমি দৌড়ে গিয়ে মিসেস রীডের সমুখে বসে পড়লাম—“মামীমা ! আমায় আর ও ঘরে বন্ধ করো না, তোমার পায়ে পড়ি। ওঘরে ভূত আছে। আমি আর অবাধ্য হব না। আমি মার খেয়ে মরে গেলেও আর কথাটি কইব না। দোহাই তোমার, লাল কামরায় আর আমায় বন্ধ করো না !”

মিসেস্ রীডের সে ভাঙ্গা-কাঁসার-আওয়াজের মত কণ্ঠস্বর আমার এখনো মনে আছে। “এইটুকু বয়সে এত ধূর্তামি শিখেছ ! চালাকি করে সাজা ফাঁকি দেওয়া ? আমাকে তুমি তেমন বোকা পাও নি। ধাপ্পা দিয়ে কাজ উদ্ধার করা ? ভূত ? ভূত না ছাই ! কেউ কোনদিন ভূত দেখল না, আর তুমি দেখলে ? মিথ্যুক কোথাকার !”

হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে মিসেস্ রীড আমাকে আবার লাল কামরায় পুরে দিলেন। নিজের হাতে তালা বন্ধ করে দিয়ে গর্জাতে লাগলেন—“এই চাকরানী দাসীগুলোর উপরে নির্ভর করে থাকা যায় না কোন ব্যাপারেই। আমি গোড়াতেই বলে দিয়েছিলাম—আমি নিজে এসে দরজা খুলে না দিলে জেনকে যেন বার হতে না দেওয়া হয়। কেন দরজা খুলেছিলে তোমরা ?”

বেসীর স্বর শোনা গেল—“এমন ধাক্কাধাক্কি করছিল—আমাদের ভয় হল সত্যিই বুঝি ও কিছু দেখেছে—”

আমি আর কিছু শুনতে পেলাম না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম মেঝেতে।

দুই

শাপে বর হল না কি ?

লাল কামরায় সেই বিভীষিকার রাত্রি যাপন করতে হয়েছিল বলেই বুঝি আমি গেট্স্হেড-এর কারাযন্ত্রণা থেকে চিরদিনের জন্য মুক্তি পেলাম।

অনেক রাত্রে যখন মিসেস্ রীড লাল কামরার দরজা খুলবার অনুমতি দিলেন, তখন বেসীরা গিয়ে দেখতে পেল—আমি অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে পড়ে আছি। তখন ধরাধরি করে আমাকে আমার বিছানায় নিয়ে আসে তারা এবং গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার লয়েড মশাইকে নিয়ে আসে আমার চিকিৎসার জন্য।

এই ডাক্তার লয়েড ডাক্তার হিসাবে হাতুড়ে হলেও মানুষ হিসাবে সহৃদয় ছিলেন। আমার শরীরের অবস্থা দেখে এবং আমার মুখে লাল কামরায় বন্দী হওয়ার ঘটনা শুনে তিনিই কৌশলে আমাকে ওখান থেকে বাইরে যাওয়ার সুযোগ করে দিলেন। মিসেস্ রীডকে পরামর্শ দিলেন—"মেয়েটাকে এখানে রেখে আপনি তো কেবলই যন্ত্রণা পাচ্ছেন। এর চেয়ে ওকে কোন ইস্কুলে পাঠিয়ে দিন। কিছু খরচা আপনার হবে, তা এখানে রাখলেও তো খরচা আছে কিছু!"

পরামর্শটা পছন্দ হল মিসেস্ রীডের। পঞ্চাশ মাইল দূরের লোউড স্কুলে আমাকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে ফেললেন তিনি। বৎসরে পনেরো পাউণ্ড দিতে হবে।

লোউডের মালিক ব্রক্লিহার্স্টমশাই এলেন একদিন গেট্স্হেডে। কী পেল্লায় লম্বা লোক! যেমন লম্বা, তেমনি সরু আর কী বেমানান রকমের বিশাল নাক ভদ্রলোকের।

যেমন চেহারা, তেমনি কথাবার্তা।

তাঁর প্রথম প্রশ্ন—"তুমি ভাল মেয়ে তো?"

এ রকম বিদ্ঘুটে প্রশ্নের কী উত্তর আমি দেব? আর আমাকে কষ্ট করে সে উত্তর দিতেও হল না। মিসেস্ রীডই আমার হয়ে জবাব

দিলেন। "ও-কথা জিজ্ঞাসা না করাই ভাল মশাই! মেয়েটি যে-রকম হলে আমরা খুশী হতে পারতাম, সে-রকম ও হয় নি। এমন মিথ্যুক, এমন হিংসুটে, এমন ধাপ্পাবাজ, অকৃতজ্ঞ মেয়ে আপনি দুনিয়াতেই কম দেখতে পাবেন। আপনার স্কুলের নাম শুনেছি। শুনেছি যে আপনি নরকের কীটকেও শুধরে ভদ্রস্বভাবের মানুষ করে তুলতে পারেন, তাই বেছে বেছে আপনার স্কুলেই এই অসভ্য মেয়েটাকে পাঠাতে চাইছি। দেখুন যদি আপনি একে মানুষ করে তুলতে পারেন।"

মিস্টার ব্রক্‌লিহার্স্ট প্রথমে অবাক্ হলেন আমার বর্বর স্বভাবের কথা শুনে, তারপর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে মরণের পরে নরকের আগুনে দগ্ধ হওয়া আমার অনিবার্য নিয়তি। অনেক উপদেশ দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন মিসেস্ রীডের কাছে। স্থির হল, যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে লোউড স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মিসেস রীড শর্ত ক'রে নিলেন ব্রক্‌লিহার্স্টের সঙ্গে যে লম্বা ছুটির সময়েও আমাকে স্কুলেই রাখতে হবে। অর্থাৎ গেট্‌স্‌হেড থেকে এ আমার চির-নির্বাসন। তা হোক, গেট্‌স্‌হেড আমার পক্ষে এমন কিছু সুখের জায়গা নয় যে, আমি ছুটিতে এখানে আসার জন্য আকুলিবিকুলি করব।

একটা কাণ্ড করে বসলাম সেইদিন। ব্রক্‌লিহার্স্ট চলে যাবার পরে আমিও নিজের ঘরে চলে আসছিলাম, হঠাৎ যেন আমার মাথায় খুন চেপে গেল। মিসেস্ রীড আমার নামে যে মিথ্যে অপবাদগুলি দিয়ে রাখলেন আজ স্কুলের অধ্যক্ষের কাছে, তার ফলে স্কুলে গিয়েও যে আমি শান্তি পাব না, এটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি সেই বয়সেই হয়েছিল। মিসেস্ রীড এতদিন তো আমায় যত রকমে সম্ভব যন্ত্রণা দিয়েছেনই, ভবিষ্যতেও যাতে আমি শান্তিতে থাকতে না পারি, তারই বন্দোবস্ত তিনি আগে থাকতেই পাকা করে রাখলেন। এ অবিচার, এ অত্যাচার আমায় পাগল করে তুলেছিল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে না গিয়ে ফিরে এলাম মিসেস্ রীডের কাছে।

"কী? কী চাও তুমি?"—বিরসকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মিসেস্ রীড।

"চাই একটা কথা জানতে। জানতে চাই যে এতগুলো মিথ্যে কথা আপনি বললেন কি করে?"

মিসেস্ রীড যেন ভূত দেখে চমকে উঠলেন। এমন কথা যে আমি

বলতে পারি তাঁর সমুখে দাঁড়িয়ে, এ তো তাঁর পক্ষে বিশ্বাস করা সত্যিই শক্ত! তিনি শুধু বলে উঠলেন—"কী? কী বললে?"

"বললাম যে আপনি ঐ ভদ্রলোককে যত কথা বলেছেন আমার সম্বন্ধে, তার প্রত্যেকটা কথাই নির্জলা মিথ্যা। আমি মিথ্যাবাদীও নই, হিংসুটেও নই, ধাপ্পাবাজও নই। আর অকৃতজ্ঞ? কী সুখে আপনি রেখেছেন আমাকে যে তার জন্য আমাকে কৃতজ্ঞ হতে হবে? আমি এ বাড়িতে নিজের ইচ্ছায় আসিনি। আমায় এনেছিলেন আমার মামা, যিনি ছিলেন আপনারই স্বামী। আপনার সেই স্বামী মরণকালে আপনাকে কি হাতে ধরে অনুরোধ করে যান নি আমাকে নিজের সন্তানের মত আদর-যত্ন করবার জন্য? আপনি স্বামীর সে শেষ অনুরোধ চমৎকার রক্ষা করেছেন! এর জন্য কি আপনাকে সাজা পেতে হবে না? মৃতের আত্মা স্বর্গ থেকে সব-কিছু দেখতে পায়। মামাও কি দেখছেন না আপনার ব্যবহার? আপনি কি রক্ষা পাবেন তাঁর ক্রোধ থেকে?"

কী সাহসে আমি মিসেস্ রীডের মত অমন একটা দুর্ধর্ষ মহিলার সমুখে দাঁড়িয়ে এই ভাবে তর্জনগর্জন করেছিলাম সেদিন আমি ক্ষুদ্র একটা দশ বছরের প্যাকাটির মত মেয়ে—ভাবতেও আজ বিস্ময় লাগে আমার। কিন্তু এ কথা ঠিক সেই দুর্ধর্ষ মহিলা সেদিন এই প্যাকাটির মত মেয়েটার শাসানি শুনে কেঁচোর মত কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। একটি কথাও তিনি এর জবাবে বলতে পারেন নি। তাড়াতাড়ি নিজের সেলাইগুলো গুটিয়ে নিয়ে তিনি পালাবার পথ খুঁজছিলেন।

কিন্তু পালাবার আগে তাঁকে আরও কিছু শুনিয়ে দিলাম আমি— "আপনি আমাকে অপবাদ দিয়েছেন মিথ্যুক, হিংসুটে, ধাপ্পাবাজ বলে। কিন্তু সত্যি কথা শুনুন—মিথ্যুক আমি নই, মিথ্যুক আপনারই ছেলেমেয়েরা। হিংসুটে আমি নই, হিংসুটে আপনার আদুরে ছেলে জন। ধাপ্পাবাজ আমি নই, ধাপ্পাবাজ হল আপনারই জোড়মানিক এলিজা, জর্জিনা। ওরা আপনাকে কী যন্ত্রণা দেয় একদিন, তা দেখতে পাবেন, আমাকে আপনি যেভাবে কাঁদিয়েছেন, ওরাও আপনাকে সেই ভাবে কাঁদাবে।"

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই মিসেস্ রীড পালিয়েছেন ঘর থেকে। ঘরে আমি একা দাঁড়িয়ে বিজয়িনীর গৌরব অনুভব করছি।

আজ পরিণত বয়সে আমার সেদিনকার আচরণের কথা স্মরণ করে আমি যে তৃপ্তি পাই খুব, তা নয়। মিসেস্ রীডের নৃশংসতা যতই নিন্দার হোক, ওভাবে আমার আত্মসংযম হারানো খুব বিসদৃশ হয়েছিল বলেই মনে হয় যেন।

* * *

বিদায়ের দিন একটু কষ্ট হচ্ছিল বেসীকে ছেড়ে আসতে। ইদানীং তার আচরণে একটু একটু স্নেহের আভাস পাচ্ছিলাম যেন। মেয়েটির স্বভাব মন্দ নয় খুব। এতদিন তার চরিত্রে যে কঠোরতাটুকু দেখেছি, তা যে চাকরির খাতিরে, মিসেস্ রীড আর তাঁর ছেলেমেয়েদের খুশি রাখবার তাগিদে, তা আমি বুঝতে পেরেছি। তার উপর আমার আর রাগ নেই কিছু।

বেসীই ভোর চারটার সময় আমায় কফি খাইয়ে গেট্‌স্‌হেড-এর সদর দরজায় পৌঁছে দিল। সেখানে দরোয়ানের ঘরে আমার বাক্স আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই দড়ি-বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। দেখতে দেখতে ঘোড়ার ডাক-গাড়ি এসে পড়ল। দরোয়ান গাড়ি থামিয়ে তুলে দিল আমাকে আর আমার বাক্সকে। "কোথায় যাবে খুকিটি?" জিজ্ঞাসা করল গাড়ির গার্ড।

"লোউড"—জবাব দিল দরোয়ান।

"বাপ্! পঞ্চাশ মাইল! এই এতটুকু মেয়ে একা যাবে?"

বেসী বলল, "তুমি একটু দেখো মুরুব্বি।"

গাড়ি ছুটল।

এখানে থেমে, ওখানে থেমে, মাঝে মাঝে যাত্রীদের খাওয়া-দাওয়ার বিশ্রাম দিয়ে দিয়ে পরের দিন সন্ধ্যার পরে গাড়ি এসে লোউড স্কুলের সামনে থামল। আমি তখন ঘুমের ঘোরে ঢুলছি। হঠাৎ গাড়ি-থামার ঝাঁকুনিতে চটকা ভেঙে যেতেই কানে এল—"এ গাড়িতে জেন আয়ার বলে কোন মেয়ে আছে?"

গার্ড উত্তর দিল—"হ্যাঁ।"

সঙ্গে সঙ্গে গার্ড আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল, নামিয়ে দিল আমার বাক্সটাও। তার পরই গড়গড় করে গাড়ি ছুটে চলে গেল আঁধারের রাজ্যে। গেট্‌স্‌হেড থেকে এবার আমি সত্যিই বিচ্ছিন্ন।

একজন দরোয়ান-গোছের লোক এসে বাক্সটা তুলে নিয়ে আমাকে

তার অনুসরণ করতে বলল। উঁচু গেট। তার ভিতর দিয়ে আমরা চললাম। অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হল। ঝোড়ো হাওয়ায় বরফকুচি উড়ছে। শীত করছে ভয়ানক।

অবশেষে স্কুলবাড়িতে পৌঁছোলাম। লম্বা একটা দালান, প্রায় আগাগোড়াই অন্ধকার, মাঝে মাঝে দুই একটা মিটমিটে আলো দেখা যায় জানালার ফাঁকে ফাঁকে। তারই একটা আলো আমাদের লক্ষ্য।

এসে প্রবেশ করলাম একটা ছোট ঘরে। ঠিক সেই সময়ই দুটি নারীও প্রবেশ করলেন উলটো দিকের দরজা দিয়ে। যিনি আগে আগে আসছিলেন, তিনি যে শিক্ষিকাদের মধ্যে কেউ একজন, তা কারও কাছে না শুনেও বোঝা যায়। সাদাসিধে বেশবাসেই তাঁর চেহারায় অসামান্য মর্যাদা ফুটে রয়েছে, শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। তাঁর সঙ্গিনীকে পরিচারিকা বলেই মনে হল।

অগ্রবর্তিনী আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর সঙ্গিনীকে বললেন—"জেনকে শোবার ঘরে নিয়ে যাও, তবে শোবার ঘরে তাকে কিছু খাবার হেঁসেল থেকে এনে দিও।"

পরে জেনেছিলাম—এই মহিলার নাম মিস্ টেম্পল। ইনি লোউড বিদ্যালয়ে তত্ত্বাবধায়িকা। মিস্টার ব্রক্‌লিহার্স্টের নির্দেশমত ইনিই স্কুলের পরিচালনা করেন।

* * *

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গল এক নতুন পরিবেশের ভিতর।

সকাল বলি কেন, তখনও রাত ভোর হয় নি। চারটার সময়ই ঘণ্টা বাজল একটা। ধড়মড় করে উঠে পড়ল মেয়েরা। আমাকেও উঠতে হল। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে নিয়ে নীচের হলঘরে সমবেত হলাম সবাই। সেখানে সবাই মিলে প্রার্থনা। তারপর নাম-ডাকা।

নাম-ডাকার পরে চার ভাগে ভাগ হয়ে গেল মেয়েরা। ঐ একই হলের ভিতরে। এক এক দল মেয়ে নিয়ে এক এক জন শিক্ষিকা বসে গেলেন। অর্থাৎ শিক্ষিকা বসলেন চেয়ারে, মেয়েরা যে যেভাবে পারে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়া মুখস্থ করতে লাগল। আমি ভিড়ে গেলাম সবচেয়ে ছোট মেয়েদের দলে। এক এক দলে প্রায় কুড়িটি করে মেয়ে।

আট দশ থেকে সতেরো আঠারো পর্যন্ত বয়সের মেয়েরা রয়েছে এখানে। কী বিশ্রী পোশাক তাদের! গেট্‌স্‌হেড থেকে দূরে দূরে

বেড়াতে গেছি যখন, বস্তিতে এমনি পোশাক-পরা মেয়েদের দেখেছি। একটা লম্বা আঁটো সাদা জামা গলা থেকে কোমর অবধি নেমেছে, তার দুই ধারে দুটো পকেট। ছোটদের যেমনই হোক, বড় বড় মেয়েকে সেই অদ্ভুত পরিচ্ছদে ঠিক সং-এর মত দেখাচ্ছিল।

আর কী দীন স্বাস্থ্য মেয়েগুলির! আমি যে রোগা প্যাকাটির মত মানুষ, আমার চাইতেও এরা রোগা। তা ছাড়া এদের চোখের কোল আর চিবুকের হাড় দেখলেই বোঝা যায়—এরা পেট ভরে খেতে পায় না। আমি তো গেট্‌সহেডে খাওয়ার কষ্টটা অন্ততঃ পাই নি কোনদিন। বেসী আর কিছু না করুক, খেতে দিত যথেষ্ট।

এর কারণটা বুঝতে পারা গেল একটু পরে যখন প্রাতরাশের ঘরে ডাক পড়ল। লম্বা বেঞ্চ পাতা, সামনে সরু টেবিল। পাশাপাশি বসে গিয়েছে সব মেয়ে। আমিও বসেছি। একটা হালুয়ার মত পদার্থ চামচে কেটে কেটে দিয়ে গেল প্রত্যেকের ডিশে। তখনই খাওয়ার উপায় নেই, যদিও ক্ষুধার্ত মেয়েগুলি খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। খাওয়ার উপায় নেই, কারণ প্রতিবার খাওয়ার আগে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাতে হবে, তিনি এই খাদ্য জোগাচ্ছেন বলে। প্রার্থনা শুরু হল। শিক্ষিকাদের ভিতরেই একজন প্রার্থনার পরিচালনা করছেন। কী দীর্ঘ সেই ভাষণ!

অবশেষে তা শেষ হল এবং যার যার সমুখের রেকাবির উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেয়েরা। কিন্তু এক চামচ মুখে দিয়েই, হায়, হায় আমার তো গা গুলিয়ে উঠলই; তাকিয়ে দেখি প্রত্যেকটি মেয়ে আমারই মত পিছনে হেলান দিয়ে বসে বাঁ হাত দিয়ে গলা চেপে ধরেছে, বুঝি-বা বমি আটকাবার জন্য।

কী দুর্গন্ধ বিস্বাদ খাবার!

আমি আর দ্বিতীয় চামচ মুখে তুললাম না। তুলল না অনেকেই। যে দুই একজন দুঃসাহসে ভর করে খাওয়ার চেষ্টা করতে গেল, তাদের সঙ্গে সঙ্গেই চামচ ছুড়ে ফেলে দিয়ে বাইরে ছুটতে হল মুখে হাত চাপা দিয়ে।

এত সাধের, এত প্রতীক্ষার প্রাতরাশ, যেমনকার তেমনি পড়ে রইল টেবিলে। যারা খেতে বসেছিল, তারা উঠে চলে গেল। শিক্ষিকারাও চার জন খেতে বসেছিলেন মেয়েদের সাথে, উঠে গেলেন তাঁরাও।

তারপর আবার পড়া আরম্ভ হল। এবার মিস্ টেম্পল এসে বসলেন সবচেয়ে উঁচু ক্লাসের মেয়েদের পড়াবার জন্য। কিন্তু পড়াবার আগে সমবেত সব মেয়েকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, "শোনো মেয়েরা, আমি শুনে দুঃখ পেয়েছি যে আজকার প্রাতরাশটি কার ভুলে বা অবহেলায়, তা এখনও জানতে পারি নি—একেবারেই অখাদ্য হয়েছিল। তোমরা ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছ—এ বড় পরিতাপের কথা। সেই জন্য আমি নিজের দায়িত্বে ব্যবস্থা করেছি যে এবেলায় পড়ার শেষে একটা লাঞ্চ দেওয়া হবে তোমাদের—রুটি আর মাখন।"

এ যেন একটা অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ। অর্ধেক মেয়ে এখন থেকেই জিভ চাটতে শুরু করল। পড়ায় মন বসল না কারও। কোন দিনই বসে না—তা পরে শুনেছিলাম। কী করে বসবে? আজকার খাবারটা পুড়ে দুর্গন্ধ হয়েছিল বলে কেউ খেতে পারে নি। অন্য দিন পোড়ে না, দুর্গন্ধ হয় না—তা ঠিক। কিন্তু পরিমাণ? সে যে একটা চড়ুইয়ের ক্ষুন্নিবৃত্তির পক্ষেও প্রচুর নয়। পেটে জ্বালা থাকলে পড়ায় মন দিতে কে পারে শুনি? দুই একদিন থাকতে থাকতে বিশ্রী সব অনাচার চোখে পড়তে লাগল। এই খাবার নিয়েই। পরিমাণ কম, ছোট মেয়েদের যদি বা তাতে আধপেটা হয়, বড়দের পেট সিকিও ভরে না তাতে। তারই জন্য রীতিমত লুঠপাট চলে খাদ্য নিয়ে। টেবিলে বসেই শিক্ষিকারা নিজের খাবারে মনোনিবেশ করা মাত্রই বড় বড় মেয়েরা চিলের মত ছোঁ মেরে ছোট মেয়েদের খাবারের বৃহৎ অংশ তুলে নিয়ে যায়। অসহায় খুদে মেয়েগুলো কাঁদো-কাঁদো মুখে চেয়ে থাকে, প্রতিবাদের সাহস পায় না। প্রতিবাদ করে তো পার পাওয়ার জো নেই। আড়ালে পেলেই বড়রা তাদের মেরে ঢিট করে দেবে।

আমার উপর যেদিন প্রথম এই রকম বোম্বেটেগিরি হল, আমি লাফিয়ে উঠলাম শিক্ষিকাদের কাছে নালিশ করবার জন্য। আমায় টেনে বসিয়ে দিল হেলেন বার্নেস। নিজের খাবারটা তুলে দিল আমার ডিশে। আমি অবশ্যই তার সবটা খেলাম না, অর্ধেকটা তাকে ফিরিয়ে দিলাম।

হেলেন আমার চেয়ে অনেক বড়। পড়েও উঁচু ফর্মে। লেখাপড়া নিয়েই আছে, লেখাপড়ায় ভালও বোধ হয়। কিন্তু কেমন তার ভাগ্য,

শিক্ষিকারা কেউই তার উপর খুশী নন। একমাত্র মিস্ টেম্পল ছাড়া। হেলেনের চেহারা এত রোগা, আর যখন তখন সে এমন খুক্ খুক্ করে কাশে, আমার তো মনে হয় ওর কোন অসুখ আছে। মিস্ টেম্পলকে দেখেছি—মাঝে মাঝেই হেলেনকে জিজ্ঞাসা করছেন—"আজ আছ কেমন, হেলেন?" হেলেনের সর্বদাই এক উত্তর, "ধন্যবাদ। ভালই আছি।" নালিশ তার মুখে কখনও কেউ শুনবে না। ব্যাধির বিরুদ্ধেও না, শিক্ষিকাদের বা সহপাঠিনীদের বিরুদ্ধেও না। তার এই সহনশীলতার জন্যই বুঝি সে সকলের অপ্রিয়।

আমাকে সে কী জানি কেন, ভালবাসে একটু। কষ্ট সহ্য করতে হয়, এই উপদেশটি সে আমাকে প্রায়ই দেয়। আমি রুখে দাঁড়াই। কেন সহ্য করব? অন্যায়ের প্রতিবাদ করাই কি উচিত নয়? তর্ক করি হেলেনের সাথে। হেলেন বলে—"আমরা গরিবের মেয়ে। গরিব না হলে এখানে আসব কেন? গরিবের জন্ম কষ্ট সহ্য করবার জন্যই।" আমি তার কথায় সায় দিতে না পারলেও এ-কথার উপরে আর তর্ক করি না।

এখানে এসে অবধি মিস্টার ব্রকলিহার্স্টকে এ-যাবৎ দেখিনি। শুনেছি—গেট্স্হেড থেকেই তিনি তাঁর এক বড়লোক বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন। যতদিন তিনি না ফেরেন, ততদিনই ভাল। তাঁর সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক আছে আমার। কারণ মিসেস্ রীড তাঁর মনকে বিষিয়ে দিয়েছেন আমার বিরুদ্ধে। একে ব্রকলিহার্স্ট নিষ্ঠুর স্বার্থপর লোক, তার উপর মিসেস্ রীডের উসকানি। তিনি আমাকে কষ্ট দিতে কসুর করবেন না, এ বিশ্বাস শিকড় গেড়ে বসেছে আমার মনে। তাই ভগবানকে ডাকছি—মিস্টার ব্রকলিহার্স্ট যেন আর না ফেরেন।

কিন্তু এ-রকম ডাকায় কি কোন ফল হয়? একদিন সকালে একটা গাড়ি এসে ঢুকল স্কুলের হাতায়। গাড়ি থেকে নামল সেই বিশাল নাক। অসম্ভব লম্বা, অসম্ভব সরু দেহের মটকায় একটা অসম্ভব বৃহৎ নাসিকা। আমার বুকের ভিতর দুরদুর করে উঠল।

একা তিনি নন, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আর কন্যা। ভদ্রমহিলাদের কী গয়নার বাহার! কী পোশাকের জৌলুস। সিল্কে সাটিনে সোনায় মুক্তোয় ঝলমল করছেন মায়ে ঝিয়ে। হায় হায়! গেট্স্হেড-এর বাড়িতে ব্রকলিহার্স্ট যে অনেক রকমে সাদাসিধে জীবনযাপনের মাহাত্ম্য

কীর্তন করেছিলেন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে। সাদাসিধে পোশাক বুঝি লোউডের ছাত্রীদের জন্যই শুধু? নিজের ঘরে বুঝি ও জিনিস অচল? লোকটাকে স্বার্থপর বলে আমার যে ধারণা হয়েছিল, তা আরও বদ্ধমূল হয়ে গেল।

স্কুলঘরে এসে তিনি বুঝি আমাকেই খুঁজছিলেন। খুঁজে পাওয়া তো শক্ত কিছু নয়। দেখতে পেয়েই আমাকে এগিয়ে আসতে হুকুম করলেন। আমি যেন আর হেঁটে আসতে পারি না। দুটো পা যেন ভারী হয়ে উঠেছে পাথরের মত। মিস্ টেম্পল মনে করলেন আমি বুঝি শুধু শুধুই ভয় পাচ্ছি। তিনি এসে আমার হাত ধরে ব্রকলিহার্স্টের সমুখে দাঁড় করিয়ে দিলেন, কানে কানে বললেন—"ভয় কী? ওঁকে দেখতে কড়া লোক হলেও লোক ভাল।"

আর লোক ভাল!

আমাকে একটা টুলের উপর দাঁড় করিয়ে দিলেন ভদ্রলোক, যাতে স্কুলের সবগুলি মেয়ে আমাকে ভাল করে দেখতে পায়। তারপর তিনি আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলতে শুরু করলেন—"মেয়েরা! আমি একান্ত দুঃখিত যে একটা অতি অপ্রিয় কর্তব্য আমাকে করতে হচ্ছে। তোমাদের সতর্ক করে দেওয়া আমার কর্তব্য। মেষপালের ভিতর নেকড়ে ঢুকেছে একটি। এই যে মেয়েটিকে দেখছ, দেখতে ছোট হলে কী হবে, গুণের এর সীমা-পরিসীমা নেই। এমন মিথ্যাবাদী, এমন প্রতারক, এমন অকৃতজ্ঞ—কোন জেলখানাতেও তোমরা খুঁজে পাবে না। শৈশব থেকে যে ভদ্রমহিলা সন্তানের মত একে লালনপালন করেছেন, তাঁকেই এ অমান্য করেছে, অশ্রদ্ধা করেছে, তাঁর নিজের পুত্রকন্যাদের নামে হিংসা করে মিথ্যা অভিযোগ করতেও সংকুচিত হয়নি। তোমরা তো জান যে এ-রকম পাপীর স্থান কোথায় নির্দেশ করেছেন ভগবান?"

একটা গুঞ্জন উঠল, "নরকে।"—মেয়েরা পরস্পরের দুঃখকষ্টে সহানুভূতি জানাতে সর্বদাই অনিচ্ছুক। বিশেষতঃ এক্ষেত্রে সে-রকম সহানুভূতি জানাতে গেলে যে সবাইয়ের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ব্রকলিহার্স্টের বিরাগভাজন হতে হবে, তা তো আর বুঝতে বাকী নেই এদের!

ব্রকলিহার্স্ট অনেকক্ষণ ধরে বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন। ক্রমেই তাঁর ধিক্কার জোরালো হয়ে উঠছে, গমগম করছে তাঁর দরাজ গলার গম্ভীর

আওয়াজ সারা হলটা জুড়ে। আমি আর তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পারছি না। একটা সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে কানে, মাথার ভিতর সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

তারপর বোধ হয় আমি পড়ে গেলাম অজ্ঞান হয়ে।

জ্ঞান হতেই দেখি মিস্ টেম্পল আমার শিয়রের কাছে বসে আছেন। আমার মাথায় অডি-কলোনের পটি চাপানো। আমি কাঁদতে লাগলাম।

মিস্ টেম্পল বললেন, "কেঁদো না। আমার বিশ্বাস মিস্টার ব্রকলিহার্স্ট ভুল খবর পেয়েছেন, তাঁর অভিযোগগুলির কোন ভিত্তিই নেই। তুমি যদি একটু সুস্থ হয়ে থাক, তা হলে তোমার ইতিহাস আমাকে বল। আমি সত্য মিথ্যা যাচাই করব। মিস্টার ব্রকলিহার্স্ট আমার উপরওয়ালা হলেও তাঁর অন্যায়ের প্রশ্রয় আমি দেব না।"

বলে ফল কী হবে, তা জানি না। কিন্তু এই দয়াশীলা মহিলার সস্নেহ আশ্বাসে আমি সাহস পেলাম খানিকটা। গেট্‌সহেড-বাসের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার কথা, বিশেষ করে লাল কামরায় বন্ধ হওয়ার ব্যাপারটা সবিস্তারেই বললাম তাঁকে। সব শুনে তিনি একটিমাত্র প্রশ্ন করলেন—"সেই ডাক্তারের নাম কী ?"

আমি বললাম—"ডাক্তার লয়েড।"

সুস্থ হয়ে উঠে আমি আবার পড়াশুনা করছি। হেলেন বার্নেস ছাড়া কোন মেয়েই আমার সঙ্গে কথা বলে না বা মেশে না। আমি যে নরকে যাব—ব্রকলিহার্স্টের এ-কথা সবাই বাইবেলের বাণীর মতই অভ্রান্ত বলে ধরে নিয়েছে। সুতরাং নরকযাত্রীর সঙ্গে কে ঘনিষ্ঠতা করতে চায় ?

দিন পনেরো বাদে একদিন স্কুল বসেছে। মিস্ টেম্পল সমস্ত শিক্ষিকা এবং সমস্ত মেয়েদের সম্বোধন করে বললেন, "সেদিন জেন আয়ারের সম্বন্ধে কতকগুলি ভুল কথা তোমরা শুনেছ। মিস্টার ব্রকলিহার্স্ট কতকগুলি ভুল খবরের উপর নির্ভর করেছিলেন। এই চিঠিখানি শুনলেই সবাই বুঝতে পারবে যে জেন আয়ারের নামে যত অভিযোগ হয়েছে, তা সবই মিথ্যা। আসলে তাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দেওয়ার জন্যই তার অভিভাবিকা মিথ্যা দোষারোপ করেছিলেন তার সম্পর্কে।"

চিঠিখানি ধীরে ধীরে কিন্তু উঁচুগলায় পড়ে শোনালেন মিস্ টেম্পল।

লিখছেন ডাক্তার লয়েড। মিস্ টেম্পল তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন আমার সম্বন্ধে সব কথা। ভদ্রলোক যেভাবে আমার পক্ষ সমর্থন করে উত্তর দিয়েছেন, তা আমার আশা করবারই কোন অধিকার ছিল না। তিনি লিখেছেন—

"মিসেস্ রীড কোনদিনই মেয়েটিকে সুনজরে দেখেন নি বা তার সম্বন্ধে কোন যত্ন নেন নি। ওকে গলগ্রহ বিবেচনা করেছেন চিরদিন, দাসদাসীর চাইতেও দুরবস্থায় ওকে রেখেছেন, যদিও মেয়েটি তাঁর স্বামীর সাক্ষাৎ ভাগিনেয়ী। মিসেস্ রীডের নিজের ছেলেমেয়েগুলি অপদার্থ বলেই বোধ হয় জেন তাঁর আরও বিষনজরে পড়েছিল। তার উপর নির্যাতন যা হয়েছে, তা চরম। লাল কামরার ভুতুড়ে ঘরে রাত্রি-বেলায় তাকে বন্দী করে রাখা একান্তই অমানুষিক নিষ্ঠুরতা হয়েছিল। তবে ঐটাই জেনের জীবনে একমাত্র নির্যাতন নয়। আমি বিশেষ খোঁজ নিয়ে জেনেছি—অত বড় অত্যাচার হামেসাই না হলেও ছোটখাট অত্যাচারে তাকে দৈনিকই ভুগতে হত। মিথ্যাবাদী বা ধাপ্পাবাজ বলে জেনকে ও বাড়ির দাসদাসীরা কেউ মনে করে না, আমি গোপনে জিজ্ঞাসা করে সে খবর পেয়েছি। আর অকৃতজ্ঞ? কৃতজ্ঞ হওয়ার মত কোন ব্যবহার তো জেন পায় নি কোনদিন! মিসেস্ রীড যে তাকে কী চোখে দেখেন, তা তো এইতেই বোঝা যায় যে বিদায়বেলায় তিনি তাকে এক ঝুড়ি অপবাদ দিয়ে বিদায় করেছেন। বিবেক বলে কোন বস্তু যার আছে, সে কি একটা ছোট মেয়ের স্কুলে এই রকম মিথ্যা অভিযোগ শুরুতেই করতে পারে?"

চিঠি শুনে মেয়েরা সবাই হাসিমুখে এগিয়ে এল আমার দিকে, হেলেন আমাকে আড়ালে পেয়েই জড়িয়ে ধরল। মিস্ টেম্পল চিঠির একটা নকল ব্রকলিহার্স্টকে পাঠিয়েছিলেন—ফলে ভদ্রলোক আর কখনও আমার নাম উল্লেখ করেন নি মুখে।

মিস্ টেম্পলের দয়া আমি কোনদিন ভুলি নি।

তিন

দিনের পরে দিন কেটে যায়, মাসের পরে মাস। মিসেস্ রীড যে অভিশাপ আমার ভাগ্যের সঙ্গে চিরদিনের জন্য জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন,

মিস্ টেম্পলের দয়ায় তা থেকে আমি মুক্ত হয়েছি। লোউড স্কুলে দুঃখ-কষ্ট যতই থাকুক, পড়াশুনা করবার যেটুকু সুযোগ সেখানে আছে, পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছি আমি। মিস্ টেম্পল আমার উপর অনুগ্রহ রেখেছেন, হেলেন বার্নেসের কাছ থেকে বন্ধুত্ব এবং সদুপদেশ পর্যাপ্ত পরিমাণেই পাচ্ছি, দিন আমার ভালই কাটছে। পড়াশুনায় আমার উন্নতি দেখে শিক্ষিকারা খুশী হয়েছেন।

দ্বিতীয় বৎসরে স্কুলে একটা দারুণ বিপর্যয় ঘটল। বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাদুর্ভাব হল টাইফয়েডের। ব্যাপকভাবেই আক্রমণ হল এই মারাত্মক ব্যাধির। পড়াশুনা বন্ধ করে দিতে হল। যে সব মেয়ের যাওয়ার জায়গা ছিল, তারা সেখানে চলে গেল। যাদের সে-রকম সুযোগ ছিল না, তারা সারাদিন মাঠেঘাটে বনছায়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগল, যতক্ষণ স্কুলের বদ্ধ বিষাক্ত হাওয়ায় নিশ্বাস না নিয়ে পারা যায়, ততক্ষণই স্বস্তি। আমি এই মেয়েদের দলে ভিড়ে পড়লাম, কিন্তু পড়াশুনা একেবারে ছাড়লাম না। বনের ধারে বা পাহাড়ের গায়ে কোথাও গিয়ে নিরিবিলি বসি, পড়াশুনা করি নিজের মনে, বা ছবি আঁকি। ছবি আঁকার হাত আমার ভালই, এ-কথা শিক্ষয়িত্রীরা বলেছেন।

রোগীরা একে একে মরতে লাগল। চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই, যা করেন ভগবান। স্কুলের অর্ধেক মেয়ে নিঃশেষ হয়ে গেল। মিস্টার ব্রকলিহার্স্ট সেইদিনই স্কুলের ত্রিসীমা মাড়ানো বন্ধ করেছেন, যেদিন প্রথম রোগীটির ব্যাধিকে টাইফয়েড বলে ধরতে পারা গিয়েছে। মিস্ টেম্পল সারাক্ষণ রুগ্না মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত। তাদের ওষুধ খাওয়ানো, শুশ্রূষা করা—সব তাঁর একার হাতে। কী অপরিসীম ধৈর্য আর স্নেহ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন এই মহিলা!

দেখি না হেলেন বার্নেসকেও। জিজ্ঞাসা করেও কারও কাছ থেকে সদুত্তর পাই না। এক একবার সন্দেহ হয় সে হয়ত মরে গিয়েছে। কিন্তু একদিন দৈবাৎ মিস্ টেম্পলকে দেখতে পেয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম—হেলেন মরে নি। তবে তার খুবই অসুখ। টাইফয়েড তার নয়। তার ব্যাধি ক্ষয়রোগ। সেই যে তাকে খুক্ খুক্ করে কাশতে শুনতাম, সে এই ক্ষয়রোগেরই সূচনা।

"কোথায় আছে হেলেন?" জিজ্ঞাসা করলাম ব্যগ্রভাবে।

"সে তুমি শুনে করবে কী? এইটুকু বলতে পারি টাইফয়েড রোগিনীদের সঙ্গে সে নেই।" বলে মিস্ টেম্পল চলে গেলেন। অর্থাৎ হেলেন কোথায় আছে, তা আমাকে তিনি বলতে চান না, পাছে নিষেধ না শুনে আমি হেলেনকে দেখতে যাই।

কিন্তু হেলেন কোথায়, তা আবিষ্কার করতে কষ্ট হল না বেশী। অল্প আয়াসেই আমি জেনে ফেললাম মিস্ টেম্পল নিজের বসবার ঘরেই তার জন্য একটা বিছানা করে দিয়েছেন। সেই রাত্রেই আমি গোপনে উঠে গেলাম মিস্ টেম্পলের ঘরে। উনি তখন টাইফয়েড রোগীদের কাছে থাকবেন, জানা ছিল আমার। কাজেই বাধা পাব না, এ-ভরসা আমার ছিল।

হেলেন শুয়ে আছে চাদর মুড়ি দিয়ে। তার চেহারায় বেশী পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। কেবল রং একটু ফ্যাকাশে মনে হল। সে খুব খুশী হল আমাকে দেখে। "কেন এলে? এ-রোগ ছোঁয়াচে"— এই বলে একটু অনুযোগ যে না করল, তা নয়, কিন্তু তারপরই আমার হাত ধরে বসাল তার বিছানায়। আমি শুয়েই পড়লাম তার বিছানায় তার পাশে, তাকে জড়িয়ে ধরলাম আদর করে। আঃ, কী-তৃপ্তি যে সেই মুহূর্তে ফুটে উঠতে দেখেছিলাম হেলেনের রোগশীর্ণ মুখে।

স্নেহের ভিখারী কিশোরীর প্রাণ, শেষ সময়ে একবিন্দু স্নেহের পরশ পেয়ে কতখানি যে ধন্য হল, তা জানেন একমাত্র ভগবান।

বেশী কথা কইবার শক্তি তার নেই। সে দুই একটি কথার পরেই আমাকে বাহুপাশে জড়িয়ে ধরেই ঘুমিয়ে পড়ল। আর, আশ্চর্য! তার বিছানাতে শুয়ে তার আলিঙ্গনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম আমিও।

ঘুম ভাঙ্গল সকালবেলায়। মিস্ টেম্পল কখন এসেছেন, টের পাই নি। তিনি আমাকে দেখে যতই আশ্চর্য হোন না কেন, আমাকে ডেকে তোলেন নি। নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে দিয়েছেন আমাদের দুটিকে।

কিন্তু ঘুম যখন ভাঙ্গল, তখন সে কী বেদনার জাগরণ! দেখলাম— আমার আলিঙ্গনের মধ্যে হেলেনের যে দেহখানি আবদ্ধ রয়েছে, তা প্রাণহীন। ঘুমের ভিতরে নিঃশব্দেই তার প্রাণবায়ু কখন বেরিয়ে গিয়েছে, তা তারই বিছানায় শুয়ে আমিও টের পাইনি, পাশের ঘরে শুয়ে টের পান নি মিস্ টেম্পলও।

*　　*　　*

হেলেন বার্নেসকে সমাধি দেওয়া হল স্কুলের ভিতরেই।

আর তার পর থেকেই টাইফয়েডেরও প্রকোপ কমতে লাগল।

অবশেষে শেষ রোগিনীটি সুস্থ হয়ে উঠবার পরে ও-অঞ্চলের কয়েকজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক লোউড স্কুল পরিদর্শন করতে এলেন। একটা বিদ্যালয়ের অর্ধেক মেয়ে টাইফয়েডে মারা গেল এক মাসের ভেতর—এ সংবাদে সারা দেশে একটা চাঞ্চল্য এসে গিয়েছে। জনসাধারণ উপলব্ধি করেছে যে এ স্কুলের পরিচালনার ব্যাপারে কোথাও সাংঘাতিক গলদ আছে একটা।

সামান্য অনুসন্ধানেই ভদ্রলোকেরা বুঝতে পারলেন যে পুষ্টির অভাবই ছিল ছাত্রীদের আসল ব্যাধি। তারই দরুন টাইফয়েডের আক্রমণ হওয়া মাত্রেই কাস্তের মুখে গমের চারার মত তারা ধরাশয্যা গ্রহণ করেছে।

এ পুষ্টির অভাবই বা কেন? মিস্ টেম্পল রেখে ঢেকে কথা কইলেন না। মিস্টার ব্রকলিহার্স্টের কার্পণ্যই যে এর কারণ, তা তিনি সবাইকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকেরা ব্রকলিহার্স্ট সম্বন্ধে বিশ্রী একটা ধারণা নিয়ে স্কুল থেকে বিদায় নিলেন।

তারপরই একটা আন্দোলন গড়ে উঠল লোউড স্কুলের সংস্কারের জন্য। ব্রকলিহার্স্টের আসন এখানে কায়েমী, তাকে ছেঁটে ফেলা সম্ভব হল না একেবারে। কিন্তু তার হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা আর রইল না। একটি কমিটি গড়ে তারই হাতে স্কুল পরিচালনার ভার অর্পিত হল। সে কমিটিতে ব্রকলিহার্স্টের আসন থাকলেও সে এখন বিষহীন সর্পে পর্যবসিত হল, কারণ অন্য সদস্যেরা সবাই একযোগে তাকে কোণঠাসা করে রাখতে কৃতসংকল্প।

নতুন পরিচালনায় লোউডের আমূল পরিবর্তন হতে লাগল। আট মাইল দূরে পাহাড়ের গায়ে নতুন স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্মিত হল, কারণ পাহাড়তলীর বাড়িটা যে ছাত্রীদেরও স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়, এ বিষয়ে কমিটি একমত। মিস্ টেম্পল পূর্ববৎ তত্ত্বাবধায়িকা তো রইলেনই, তাঁর হাতে ক্ষমতা দেওয়া হল আরও বেশী করে। নতুন আরও কয়েকজন শিক্ষয়িত্রীও এলেন।

কাজেই লোউড—যে বিদ্যালয়ের অবস্থা এবং পরিবেশ ছিল কদর্য, তা ক্রমশঃ আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠল। এতে অন্যের কথা বলতে পারি

না, সবচেয়ে উপকৃত হলাম আমি, অনাথা জেন আয়ার। কারণ আমার ঘর বাড়ি আশ্রয়, যা কিছু বল, সবই এই লোউড। এখানের সুখের মুখ দেখতে পেয়ে আমার সব নৈরাশ্যের অবসান হল। প্রচুর এবং পুষ্টিকর খাদ্য! স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া! উৎসাহী শিক্ষিকাদের অজস্র সাহায্য! আর চাই কী! কেবল এক দুঃখ আমার, এ সুখের দিন হেলেন বার্নেস দেখে যেতে পেল না।

* * *

দিন কাটে, মাস কাটে, বৎসর কাটে। ছয় ছয়টা বৎসর এই ভাবে একে একে কেটে গেল মসৃণভাবে। লোউডের শেষ পরীক্ষা আমি দিয়েছি। সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছি আমি। এইবার লোউড কর্তৃপক্ষ, মিস্ টেম্পলেরই সদয় সুপারিশে অবশ্য, আমায় শিক্ষিকা পদে নিযুক্ত করে নিলেন লোউড স্কুলেতেই। ছাত্রী ছিলাম, শিক্ষিকা হয়েছি। আর এ জীবনে আমার কামনা করবার কী রইল? বেতন বেশী নয়, তা হলেও তাতেই আমার নিজের সামান্য খরচা সংকুলান হয়ে যাবে। আজ আমি স্বাধীন। এতদিন লোকলজ্জার ভয়ে মিসেস্ রীডই বছরে পনেরো পাউণ্ড করে লোউডে পাঠিয়ে দিতেন আমার জন্য। এখন তার আর প্রয়োজন নেই। আমার অনুরোধে মিসেস্ টেম্পল চিঠি লিখে দিলেন মিসেস্ রীডকে যে জেন আয়ার স্বাবলম্বী হয়েছে, আর তার সাহায্যের প্রয়োজন নেই। এ চিঠির কোন জবাব এল না। জবাব আসবে প্রত্যাশাও করি নি।

বিদ্যালয়ে পড়াই, এবং নিজে পড়াশুনা করি। ইংরেজী ফরাসী দুটো ভাষা ভালই জানি আমি। জানি সামান্য গানবাজনা। তার চেয়ে কিছু বেশী জানি ছবি আঁকতে। বললে কেউ সেটাকে আমার দম্ভ বলে ভাববেন না—ছবি-আঁকার হাত আমার বেশ ভালই।

দুটো বৎসর এইভাবে কেটে গেল। কেটে গেল পরম সুখেই। তারপর একটা পরিবর্তন এল আমার জীবনে। লোউড বিদ্যালয়ের আকর্ষণ আর রইল না আমার উপরে।

আমার সহাধ্যায়িনীরা কবে চলে গিয়েছে এখান থেকে। আমার কালের শিক্ষিকারাও কেউ নেই—একমাত্র মিস্ টেম্পল ছাড়া। বলতে গেলে মিস্ টেম্পলই এ-যাবৎ একাধারে আমার শুভানুধ্যায়িনী, অভিভাবিকা এবং বান্ধবী ছিলেন। সেই তিনি চলে গেলেন লোউড

ছেড়ে। অন্য কোন কারণে নয়, বিবাহ করেছেন বলেই তাঁকে চলে যেতে হল।

বিদায় বেলায় সে-বেদনা আমার অসহ্য বোধ হল। জীবনে ভালবাসার পাত্রী এ-যাবৎ মাত্র দুটি পেয়েছি। দুটির কাছ থেকেই অসময়ে ছাড়াছাড়ি হল। হেলেন বার্নেসকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল মৃত্যুদেবতা, মিস্ টেম্পলকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন পরিণয়দেবতা প্রজাপতি। লোউড শূন্য লাগছে আমার চোখে। শিক্ষিকার কর্তব্য যথারীতি সম্পাদন করেও আনন্দ পাচ্ছি না।

অনিবার্যভাবেই তাগিদ অনুভব করলাম—লোউড ছাড়তে হবে। একে এ জায়গা ভাল লাগছে না তার উপর আরও একটা কথা ভাবছি। চিরদিন কি কূপমণ্ডূক হয়েই থাকব ? জ্ঞানোদয়ের পর থেকে দশ বৎসর গেট্‌স্‌হেডে কাটিয়েছি, তারপর আট বৎসর কাটিয়ে দিলাম লোউডে। জীবনের বৃহৎ একটা অংশ কেটে গেল এই দুটো স্থানের অতি সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে, যেখানে বৃহত্তর মানবসমাজের নাড়ীর স্পন্দন এতটুকুও অনুভব করা যায় না। একবার তো এখান থেকে বেরিয়ে দেখা উচিত যে বাইরের পৃথিবীটা কী রকম জায়গা, সেখানকার অপরিচিত মানুষগুলোর কাছে আমার কিছু পাওয়ার আছে কি না!

যেতে হবে এখান থেকে, স্থির করে ফেললাম এটা। কিন্তু যেতে বললেই বেরিয়ে পড়া যায় না। আমার সহায় নেই, সম্পদ নেই, আমার হয়ে একটা ভাল কথা বলে, এমন কেউ নেই। যাওয়ার আগে এমন ব্যবস্থা কিছু করে যেতে হবে, যাতে বেরিয়ে গিয়েও নিজের ভার নিজে বহন করতে পারি। সে ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ার সাহস আমার কই ? একদিন চলবার মত সাহায্য তো আমায় কেউ করবে না! আর সাহায্য আমি চাইবই বা কেন ?

অনেক ভেবে একটা উপায় স্থির করলাম। একখানা পত্রিকা আসে লোউড স্কুলে। কোন উঁচুদরের বা পাণ্ডিত্যপূর্ণ পত্রিকা নয়। নিকট-বর্তী অঞ্চলের খবরগুলোই থাকে তাতে। বিজ্ঞাপনও থাকে দু-একটা। আমি একটা বিজ্ঞাপন দিলাম তাতে কর্মপ্রার্থিনী হিসাবে। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে গৃহশিক্ষিকার পদ প্রার্থনা করলাম যে কোন ভদ্র পরিবারে। ভদ্র পরিবার মানেই ভদ্র সমাজের

একটা অংশ। সেখানে গিয়ে পড়তে পারলে সমাজের সংস্পর্শে আসতে পারব বই কি!

বিজ্ঞাপনটি লিখে পত্রিকার আফিসে পাঠিয়ে দিলাম। বিজ্ঞাপন ছাপবার দামও সেই সঙ্গে। উত্তর আসবে নিকটবর্তী ডাকঘরের পোস্টমাস্টারের নামে।

দিন পনেরো অপেক্ষা করলাম দারুণ উদ্বেগের মধ্যে। তারপর একদিন ডাকঘরে গিয়ে খোঁজ করলাম—আমার নামে কোন চিঠি আছে কিনা। পোস্টমাস্টার অনেকক্ষণ ধরে হাতড়াতেই থাকলেন। আমার বুকের ভিতরটা শুকিয়ে উঠল—তাহলে বুঝি আসে নি কোন জবাব।

কিন্তু না, হতাশ হয়েছি অকারণে। একখানা চিঠি আছে। পোস্টমাস্টার চিঠিখানা দিতেই আমি নিয়ে জামার ভিতর পুরলাম।

পড়লাম স্কুলে ফিরে এসে।

ভগবানকে ধন্যবাদ।

যা চেয়েছিলাম, তাই বটে। দূরবর্তী এক অঞ্চল থেকে মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স নামে এক মহিলা আমার বিজ্ঞাপনের জবাব দিয়েছেন।

তিনি জানতে চেয়েছিলেন আমি ফরাসী ভাষায় কথা বলতে পারি কিনা, গানবাজনা জানি কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন দুই জন ভদ্রলোকের নামও আমায় দিতে বলেছেন—যাঁরা আমার সম্বন্ধে সব কিছু জানেন।

ফরাসী ভাষা আমি ভালই আয়ত্ত করেছি, গানবাজনাও শিখেছি কিছু। কিন্তু লোউড স্কুলের বাইরে কেউই তো আমায় জানে না! কার নাম আমি দেব? অগত্যা স্কুলকর্তৃপক্ষেরই দুই জন সদস্যের নাম লিখে দিলাম মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সকে।

কয়েকদিন পরেই জানতে পারলাম ঐ দুই ভদ্রলোকের কাছে চিঠি এসেছে মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সের। এ-খবরও পরে আমার কানে এল যে ওঁরা খুব জোর সুপারিশ করেছেন আমার জন্য—লিখেছেন যে এমন কর্তব্যপরায়ণা সুশিক্ষিতা হাসিখুশী শিক্ষয়িত্রী একান্তই দুর্লভ, ইত্যাদি।

শুনে আমি খুবই কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম। চিরদিন যথাশক্তি নিজের কর্তব্য করে যাওয়ার চেষ্টা করেছি—প্রথমে ছাত্রী হিসাবে,

পরে শিক্ষিকা হিসাবে। আমার সে চেষ্টা যে উপরওয়ালাদের প্রসন্ন করতে পেরেছে, এ একটা খুবই বৃহৎ সার্থকতা।

* * *

চাকরি পেলাম। থর্নফিল্ড বলে একটি জায়গা থেকে নিয়োগপত্র এল ; এমন চমৎকার কাজ কিছু নয়, একটি আট বছরের বালিকাকে পড়াতে হবে। গৃহশিক্ষয়িত্রী হিসাবে আমার কাজ হবে তাকে ইংরেজী ও ফরাসী ভাষা শেখানো এবং সর্বক্ষণ তাকে চোখে চোখে রাখা। বেতন বৎসরে ত্রিশ পাউণ্ড মাত্র।

তা মন্দ কি! ওদের কাছে থাকব, থাকার খরচা বা খাওয়ার খরচা তো লাগবে না! ত্রিশ পাউণ্ড কম তো নয়! কত আর হাত খরচা লাগতে পারে একটা মানুষের ? বিশেষ করে পল্লীগ্রামে ?

সব বন্দোবস্ত পাকা করে, লোউড থেকে আমার বেরুতে বেশ কিছু দেরি হল। কিন্তু বিদায়ের দিন এসে গেল অবশেষে। আট বৎসরের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে লোউড থেকে বিদায় নিলাম। হেলেন বার্নেস-এর সমাধিতে ফুল দিয়ে এলাম। মিস্ টেম্পল এখন দূর দেশে, স্বামীর কর্মস্থানে ; তাঁকে চিঠি লিখে দিলাম একটা, কর্মজীবনের পথে নতুন পদক্ষেপের প্রাক্কালে তাঁর শুভেচ্ছা কামনা করে। তারপর সহকর্মিনী ও ছাত্রীদের কাছে বিদায় নিয়ে পা বাড়ালাম থর্নফিল্ডের পথে।

* * *

দীর্ঘপথ ডাকগাড়িতে অতিক্রম করে যে জায়গায় আমি নেমে পড়লাম, লোউড থেকে সেটা পুরো দুই দিনের পথ। খবর নিয়ে জানলাম একটি লোক একখানা এক ঘোড়ার টমটম নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সে আমার বাক্সটা তুলে নিল গাড়িতে, আমিও চড়ে বসলাম।

কী প্রকাণ্ড বাড়ি। রীতিমত বড়লোকের বাসস্থান, সন্দেহ নেই। তিনতলা তো বটেই, তেতলার ছাদের উপরেও যেন একসারি ঘর দেখা যায়।

গাড়ি চালিয়ে এনেছে ঐ বাড়িরই জনৈক ভৃত্য। সে আমাকে পৌঁছে দিল বৈঠকখানা ঘরে। সেখানে অগ্নিকুণ্ডের ধারে একটি বর্ষীয়সী মহিলা বসে আছেন। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন রাস্তায় কোন কষ্ট হয়েছে কিনা। আমাকে কিছু খাবার এনে দেবার হুকুম করলেন পাচিকার উপর। মোটের উপর এত বড় বাড়ির মালিককে এমন সাদাসিধে নিরভিমান দেখতে পাব এমন আশা আমি মোটেই করি নি। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

খাওয়ার পরে কাজের কথা উঠল। একটিমাত্র মেয়েকে পড়াতে হবে তা জানতাম আমি। তাকে ডেকে পাঠালেন মিসেস্ ফেয়ার-ফ্যাক্স। কয়েক মিনিটের ভিতরেই সে এসে পড়ল। ফুটফুটে একটি আট বছরের মেয়ে। তবে বড় চঞ্চলা, একে কতদূর রাধ্য করতে পারব, তা হঠাৎ বুঝতে পারলাম না। এর নাম আদেলি। ফরাসী-ভাষায় কথা কয়, যেন মুখে খই ফুটছে। মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স বললেন —"কী যে সারাক্ষণ কিচিরমিচির করে, একবর্ণও বুঝি না। এখন বাপু তুমি এসেছ, তোমার ঘাড়ে ওকে ফেলে দিয়ে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"এ আপনার কিছু হয় না বুঝি ?"

"না, না, মোটেই না। আমার তো নয়ই, মিস্টার রস্টারেরও কিছু হয় না বোধ হয়। তিনি ওকে হঠাৎ নিয়ে এলেন এবার, দেশে ফেরবার সময়।"

মিস্টার রস্টার ? তিনি আবার কে ?

আমার চোখে নীরব জিজ্ঞাসা দেখে উনি বললেন—"মিস্টার রস্টারই এ-বাড়ির মালিক।"

"মালিক ? আমি তো ভেবেছিলাম আপনিই মালিক।"

"দেখ কথা। আমি মালিক, এমনটাও যে কেউ ভাবতে পারে তা জানা ছিল না আমার। না, আমি মালিক নই, মিস্টার রস্টার আমাকে বাড়ির গিন্নী করে বসিয়ে রেখেছেন এই মাত্র। অবশ্য দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও একটা আছে আমাতে ওঁতে; কিন্তু আমি তার দরুন কোন বিশেষ খাতিরের দাবি ওঁর কাছে করি না। মাইনে পাই, দেখাশোনা করি। উনি নিজে তো বিদেশে বিদেশেই থাকেন।"

আদেলি নিজে ইংরেজী বলতে পারে না, কিন্তু শুনলে একটু একটু বোঝে। সে আমার দিকে তাকিয়ে ফরাসীতে কলকলিয়ে উঠল— "দেখুন না, উনি আমায় নিয়ে আসবার সময় বলেছিলেন উনি

এখানে থাকবেন। সে কথা উনি ভুলেই গিয়েছেন নিশ্চয়। উনি ছাড়া এ বাড়িতে ফরাসী ভাষা কেউ বোঝে না, কী ঝামেলা বলুন তো! আমি কথা কইতে না পেরে বোবা বনে গেলাম। কতদিন বাদে আজ এই আপনাকে পেয়ে দুটো কথা কয়ে বাঁচি!"

সত্যি এ বড় শাস্তি এই চপলা বালিকার পক্ষে। যা হোক— আমি মিস্টার রস্টার সম্বন্ধে ওকে কথা কইতে দিলাম না, আলাপ শুরু করলাম ওর পড়াশুনা নিয়ে। ও বইপত্র সব নিয়ে এল। দেখলাম খুব বেশী অগ্রসর যদিও ওকে বলা যায় না, তবু নিন্দা করবার মতও নয়। বুদ্ধিমতী তো বটেই, মেধাও আছে বলে মনে হল।

কিন্তু বইকেতাব কতদূর আয়ত্ত করেছে, সে পরিচয় দেবার জন্য ওকে তত ব্যস্ত দেখলাম না, যত দেখলাম নিজের নাচগান আবৃত্তির বাহাদুরি জাহির করবার জন্য। তা নাচগান মন্দ শেখে নি, বয়সের আন্দাজে, যদিও ফরাসী রীতির শিক্ষা আমাদের ইংলণ্ডে কতদূর কাজে আসবে তা এখনই বোঝা শক্ত। আর আবৃত্তি? ওর বাচনভঙ্গীর আলোচনা এখন থাকুক, বিষয়বস্তুটাই আমার কাছে আপত্তিজনক মনে হল। সে একটা ব্যর্থ প্রেমের নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বগতোক্তি, এমন কচি বয়সের মেয়েকে এমন জিনিস আবৃত্তি করবার শিক্ষা যে দিয়েছে, তার রুচিকে বলিহারি যাই। আমি কয়েক লাইন শুনেই আদেলিকে থামিয়ে দিতে বাধ্য হলাম, সে বিস্মিত ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার পানে। মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স বোঝেন না ফরাসী ভাষা, তিনি ওকে হঠাৎ থেমে গিয়ে ওভাবে তাকাতে দেখে অবাক হয়ে একবার আমার দিকে, একবার ওর দিকে চাইতে লাগলেন।

যা হোক বেচারী খুকীটার দোষ নেই। সে ছেলেমানুষ, তাকে যা শেখানো হয়েছে, তাই শিখেছে। আমি তাকে আদর করলাম, প্রশংসা করলাম, অনেক কষ্টে আবার হাসি ফুটিয়ে তুললাম তার মুখে। তারপর মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স তার ধাইকে ডেকে আদেলিকে তার সঙ্গে উপরে পাঠিয়ে দিলেন। ওর শোবার সময় হল।

রাত্রে কোথায় থাকব, মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স নিজে চললেন আমার ঘর দেখিয়ে দেবার জন্য। দোতলায় উঠে গেলাম আমরা। কার্পেট

মোড়া প্রশস্ত সিঁড়ি, তা দিয়ে উঠেই সারি সারি ঘর। বড় বড় শয়ন কক্ষ। সেদিকটাতেই গেলেন না মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স—বললেন—"কালে-ভদ্রে মিস্টার রচেস্টারের অতিথি বা বন্ধুজন এলে তাঁরাই এসব ঘরে থাকেন। আমি নিজে থাকি পিছনের সারির একটা কক্ষে, তোমাকেও তারই পাশে একখানা ঘর দিয়েছি। সে সব ঘর অমনধারা রাক্ষুসে আকারের নয়। তাতে শুয়ে 'হারিয়ে গেলাম, হারিয়ে গেলাম' মনে হয় না।"

আমি ধন্যবাদ জানালাম তাঁকে। আমার মত ক্ষুদ্র একটা প্রাণী বৃহৎ একখানা হল ঘর নিয়ে করবে কী ?

আমার জন্য যে ঘর উনি পছন্দ করেছেন, আমারও তা পছন্দ হল। খুব ছোটও নয়, সাজানো গোছানোও সুন্দর ভাবে। বিশেষ করে খুশী হলাম—পিছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে। মস্ত বড় বাগান একটা, ফুলের কেয়ারি, তরুবীথি, ঘাসে ঢাকা মাঠের টুকরো। তার শেষসীমায় একটা নীচু দেয়ালের ওপিঠে দরাজ প্রান্তর, তার মাঝে মাঝে শুধু কাঁটাঝোপ আর কাঁটাঝোপ। বুঝলাম—কেন এ বাড়ির নাম দেওয়া হয়েছে থর্নফিল্ড বা কাঁটার মাঠ।

মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলেন। থর্নফিল্ডের প্রাসাদে শুরু হল আমার প্রথম রাত্রিবাস। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। নানা এলোমেলো চিন্তা। গেট্‌স্‌হেড, লোউড, জন রীড, ব্রকলিহার্স্ট, স্কুলের হাসপাতালে সারি সারি রুগ্না মেয়ের মলিন শয্যা, হেলেন বার্নেসের কবর—কত কী যে অস্বস্তিকর ছবি !

তারপর ঘুম একসময়ে এল অবশ্য। কিন্তু ঘুমিয়েই কি শান্তি আছে ? তন্দ্রার ঘোরেই যেন কানে আসে—নিকটেই কোথাও একটা হা-হা কর্কশ হাসি। প্রথম দুই চার বার ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসেছিলাম। তারপর মনকে বোঝালাম, পিছনের মাঠে বোধহয় হায়েনার উৎপাত আছে, হায়েনার ডাক শুনেছি নাকি মানুষের অট্টহাসির মতই অনেকটা।

শেষ রাত্রিটা সত্যিই ঘুমোতে পেরেছিলাম, গাঢ় নিশ্চিন্ত ঘুম। তার ফলে সকালে উঠতে দেরি হয়ে গেল।

আজ সকালে থর্নফিল্ড প্রাসাদকে মনে হল যেন আরও জমকালো। আরও আভিজাত্যব্যঞ্জক। চারিধারের নির্জলা গ্রাম্য পরিবেশের

সঙ্গে এ যেন ঠিক খাপ খায় নি। মনে হল—কেন যে মনে হল, তা জানি না—এ বাড়ির মালিকও যদি সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে অমনি-ধারা বেমানান বেখাপ্পা হন, তাহলে আমার পক্ষে এখানে অবস্থান হয়ত ততখানি আরামের না-ও হতে পারে।

বেশীক্ষণ ভাববার সময় পেলাম না। মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স বেরিয়ে এলেন। সুপ্রভাতের বিনিময়। রাত্রে কেমন ঘুম হয়েছে—একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই সেই প্রশ্ন। তারপর উনি বললেন—"চল, প্রাত-রাশের ডাক পড়বার আগেই বাড়িটা তোমাকে দেখিয়ে আনি।"

চমৎকার মিষ্টি স্বভাব ভদ্রমহিলার।

একতলা থেকে দোতলা, দোতলা থেকে তিনতলা। যেমন দোতলায়, তেমনি তেতলাতেও বড় বড় শোবার ঘর। সারা জেলাটার সমস্ত বড়লোককে একসাথে নিমন্ত্রণ করে আনলেও, তাদের শোবার জায়গা দেবার অসুবিধা থর্নফিল্ডে হবে না। তবে তেতলার ঘরগুলি দেখে মনে হল—বহুদিন থেকে এসব ঘরে কেউ রাত্রিযাপন করে নি। একটা আবছা আলোতে সবকিছুই যেন ভুতুড়ে মনে হয়। আর আসবাবপত্রও যে কোন্ মান্ধাতার আমলের, তা, কে জানে!

মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স আমাকে ছাদে নিয়ে চললেন এইবার।

কাল সন্ধ্যায় উপর পানে এক পলক দেখেই আমার মনে হয়েছিল ছাদের উপরেও যেন এক সারি ঘর আছে। আজ দেখলাম—সত্যিই আছে তা। ঠিক সদরের দিকে নয়। রাস্তা থেকে বা সমুখের মাঠ থেকে এ ঘরগুলি দেখা যায় কি যায় না। বৃহৎ ছাদের একেবারে কিনারা ঘেঁষে। পিছন পানে নীচু-পানা কামরা কয়েকখানি।

আমি সেইদিকে তাকাচ্ছি দেখে মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স তাড়াতাড়ি বললেন—"এসব ঘর খালিই আছে একরকম। কেবল গ্রেস বলে একজন পুরোনো দাসী—বাড়ির অন্য কাজকর্ম সে কিছু করে না কখনও—সে বসে বসে সেলাই করে এখানে। এ বাড়ির দরজী বলতে গেলে সেই। গাদা গাদা কাপড়জামার মাঝখানে সে বসে থাকে একা। খাওয়ার সময় কোনদিন নীচে নামে, কোনদিন নামেও না। মানে, একটু পাগলাটে আছে দাসীটা।"

এক নিশ্বাসে এত এত কৈফিয়ৎ কাটবার কোন দরকার তাঁর ছিল,

এক কিল বসিয়ে দিতেই আমি তাকে চেপে ধরলাম

তা আমার মনে হল না। পুরোনো দাসী সেলাই নিয়েই আছে, পাগলাটে, তা বেশ তো! এত বড় বাড়িতে একটা পাগলা দাসী থাকবে—এতে আর আশ্চর্য হবার আছে কী?

হা—হা—হা—হা—হা—

চমকে উঠলাম আমি একেবারে। এ হাসি কাল রাত্রে অনেকবার শুনেছি। হায়েনার হাসি বলে ভেবেছি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু হায়েনা কি এত বড় বাড়ির চারতলায় এসে উঠে বসবে নাকি?

আমায় প্রশ্ন করবার অবকাশ দিলেন না মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স —"ঐ। ঐ! বলি নি যে আমাদের গ্রেস পুল একটি আধ-পাগলা স্ত্রীলোক? থাকে থাকে, অমনি আকাশ-ফাটানো হাসি হেসে ওঠে। অকারণেই। মানে, নেশার ঝোঁকে। মদের উপর ওর ঝোঁক খুব। কাকে দিয়ে যে মদ আনায়—ধরতে পারা যায় না। পারলে সে লোককে থর্নফিল্ডের সীমানায় আসতে দিতাম না।"

কথা কইতে কইতে মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স সিঁড়ির দিকে চলেছেন, বাধ্য হয়েই সঙ্গে চলেছি আমিও, একেবারে সিঁড়ির কোলের ঘরখানির দরজা খুলে একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক বেরুলো, সিঁড়ি দিয়ে নামবে সেও। তার হাতে কাপড়জামার গাদা নয়, খানকতক কাচের বাসন। মনে হল কাল রাত্রে ও নীচে যায় নি। খাবার উপরে নিয়ে এসেছিল। সেই সব ভোজনপাত্রই এখন নীচে পৌঁছোতে যাচ্ছে। সে সুপ্রভাত জানাল মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সকে।

"সব ভাল তো?"—মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সের প্রশ্নটা যেন কেমন লাগল আমার কানে। কী? কী সব ভাল? গ্রেস পুলের ভালমন্দর জন্য এতখানি ব্যাকুল জিজ্ঞাসা কেন মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সের?

"মো-টা-মুটি"—কিন্তুভাবে জবাব দিল গ্রেস, তারপর নিজের নামা বন্ধ করে সিঁড়ি ছেড়ে দিল আমাদের দুজনকে। নামতে নামতে ঘাড় ফিরিয়ে মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স বললেন—"ইনি মিস্ আয়ার, গ্রেস পুল! মিস্ আদেলির শিক্ষিকা।"

"ওঃ—" আমাকে সুপ্রভাত জানিয়ে গ্রেস একটু মুচকি হাসল— "নতুন জায়গা, তেপান্তর মাঠের ভিতর যক্ষিপুরী, একটু সাবধানে থাকবেন। ভয়-ডর কিছু নেই, তবে—হ্যাঁ—"

মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স তার দিকে তাকিয়ে কি ইশারা করলেন কিছু?

গ্রেস থেমে গেল। ইশারা কেনই বা করবেন, উনি? একটু আগে তিনি নিজেই তো বলছিলেন—গ্রেস একটু পাগলাটে।

যা হোক নীচে নেমে প্রাতরাশের টেবিলে আদেলিকে পেলাম। তার কিচিরমিচির অবিরাম বাক্যস্রোতে গ্রেস পুলের কথা আমি বেমালুম ভুলে গেলাম।

খাওয়ার পরেই আমার দৈনন্দিন কর্তব্যের শুরু। বাড়িতে বড় একখানা ঘরে লাইব্রেরি রয়েছে। যথেষ্ট বই, যদিও পড়বার কেউ নেই। সেই অকেজো লাইব্রেরি ঘরের এক কোণে আদেলির পড়ার জায়গা হয়েছে। ছোট টেবিল, ছোট চেয়ার ওর নিজের জন্য, আর আমার জন্য একখানা মাঝারি আরাম-কেদারা। ছবির বই, ম্যাপ, গ্লোব, রং পেনসিল—আসবাবের অভাব নেই কোনটাই।

আদেলির কী জানি কেন মনে ধরেছে আমাকে। বাচাল হলেও সে সরলা, স্নেহে তাকে বশ করা সম্ভব হবে বলেই মনে হল। আর, শিক্ষা যাকে দিতে হবে, তাকে আগে বশ করতে পারাটাই বড় কথা। বিদ্রোহী মেজাজ নিয়ে যে আসে, তাকে শেখাবার ক্ষমতা কোন গুরুরই নেই।

চার

প্রায় তিন মাস। থর্নফিল্ডের পরিবেশ বেশ অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। আদেলির পড়াশুনা, মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সের খোশগল্প আর নিজের দিবাস্বপ্ন—এ দিয়ে সারাদিন তো কোনক্রমেই ভরে তোলা যায় না! তাই বেড়িয়ে বেড়ানোটা আমার প্রাত্যহিক কার্যক্রমের ভিতর একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

সকালে বেড়াই, বিকালেও বেড়াই। অনেক দূরে দূরে চলে যাই ঘুরতে ঘুরতে। নির্জন পল্লীপথ, নিস্তব্ধ চারিধার মাঠ ঘাট কানন কান্তার—ক্বচিৎ কখনও কোন চাষীর সঙ্গে দেখা—সে টুপি তুলে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে; কখনও বা দেখা হয় মালবোঝাই কোন এক ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে, তার দিকে আমিই থাকি অবাক্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, কারণ গেরস্থালির উনকোটি চৌষট্টি রকমের জিনিস নিয়ে

সে গাড়ি শহর থেকে আসছে গ্রামের বাসিন্দাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। এত রকম খুঁটিনাটিও লাগে মানুষের সংসারে? কোন্ বস্তুটা কী রকম কাজে লাগবে ভাবতে ভাবতে অকারণেই মাথা গরম করে তুলি। এই উনিশ বছর বয়সের ভিতর 'সংসার' জিনিসটার সঙ্গে তো সংস্রব ঘটে নি কোন দিন!

একদিন অমনিই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আপনার মনে।

বিকালবেলা। রোদটা পড়তেই বেরিয়ে এসেছি। চলে এসেছি মাইল দুই। জায়গাটার নাম হে লেন। একটা শীর্ণা নদী, পাড় বেশ উঁচু। সেইখানে দাঁড়িয়ে পশ্চিম আকাশের পানে তাকিয়ে আছি। ওপারে শব্দ শোনা গেল একটা। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি এক অশ্বারোহী ভদ্রলোক আসছেন ঘোড়া ছুটিয়ে, আগে আগে প্রকাণ্ড একটা কুকুর।

নদীর পাড় এমন খাড়া যে ঘোড়া নিয়ে নামতে যাওয়া বিপজ্জনক। অশ্বারোহীর হাবভাব দেখে মনে হল পথ তাঁর পরিচিত। একটু উপরে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে রেখে, তিনি পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন কিনারার দিকে। এদিক ওদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করে খুঁজতে লাগলেন—কোন্ জায়গা দিয়ে ঘোড়াটিকে নামিয়ে আনা সহজ হবে।

এদিক্ দিয়ে কোন পথিকের আসার তো কথা নয়—মানে দূর পথের যাত্রীর। তাদের জন্য ভাল রাস্তা রয়েছে অন্য দিকে। যারা পায়ে হেঁটে চলবে, অল্প দূরে যাবে, পথহীন এই পথ তারাই ব্যবহার করে থাকে। শহরে যাওয়ার বড় রাস্তা থেকে নেমে এ-ভদ্রলোক এই জংলা জায়গায় কেন এলেন, অবাক্ হয়ে তাই ভাবছি আমি। কে-ই বা হতে পারেন ভদ্রলোক? ঘোড়া আর কুকুরের চেহারা দেখে তো মনে হয় ভদ্রলোক অর্থশালী দস্তুরমত।

আমি ভাবছি, ভদ্রলোক আর এক পা এগিয়ে আসতে গিয়েই আছাড় খেলেন। মানে, ঢালু জায়গায় পা ফসকে গেল। একটা বুনো আগাছা ধরে ফেললেন, তাই রক্ষা! বেশী নীচে গড়িয়ে পড়তে হল না। একটা মৃদু শব্দ কানে এল আমার। মৃদু হলেও সেটা যে যন্ত্রণার শব্দ, তাতে ভুল নেই। পা ভাঙলেন নাকি উনি?

একান্ত নির্জন স্থান। কোথাও একটা মানুষ চোখে পড়ে না, যেদিকেই তাকাই না কেন! মানুষের আওয়াজ কানে আসে না কোন দিক্ থেকে। ওপারে ঐ ঘোড়া, কুকুর আর ভূপতিত মানুষটি, এপারে

আমি। ভদ্রলোক ওঠবার চেষ্টা করছেন, পারছেন না। কুকুরটা তাঁর জামা কামড়ে ধরে টেনে তোলবার চেষ্টা করছে, পারছে না সেও। গম্ভীর গলায় ডেকে উঠল কুকুরটা—প্রভুর সাহায্যের জন্য লোক ডাকছে।

আমার আর চুপ করে থাকতে ভাল লাগল না। জলে নেমে নদীটা পার হয়ে গেলাম। কুকুরটা ডাকতে ডাকতে আমার কাছে এগিয়ে এল, আমি তার মাথায় হাত দিয়ে আদর করলাম। অত বড় কুকুরের গায়ে হাত দিতে অন্য সময়ে আমার সাহসই হত না। এখন সে বিপদে পড়েছে, জানি আমাকে সে বন্ধুভাবে নেবেই।

ভদ্রলোক আমাকে দেখেছেন। নীরবে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। কাছে এগিয়ে আসতেই দেখি—তাঁর মুখে যন্ত্রণার আভাস ছাপিয়ে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠেছে। কৌতুক? কিসের জন্য? অত বড় মানুষটাকে আমি এই ক্ষীণা নারী সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছি—এই জন্যই কি কৌতুক?

যা হোক, সে চিন্তার প্রয়োজন নেই আমার। যেটুকু আমার কর্তব্য, তাই করব। কাছে গিয়ে স্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম— "আপনার লেগেছে মনে হচ্ছে, কীভাবে আপনার সাহায্য করতেপারি?"

"সাহায্য?"—কী গম্ভীর আওয়াজ!

একটু থেমে বললেন—"আপনাকে ধরে আমি উঠতে পারি। কিন্তু ঘোড়ার কাছ পর্যন্ত আপনার উপর ভর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা যদি করি, আপনার খুবই কষ্ট হবে। তার চেয়ে আপনি যদি ঘোড়াটাকে লাগাম ধরে আমার কাছে এনে দিতে পারেন, আমি ঐ ঘোড়াকে ধরেই উঠে দাঁড়াতে পারি এবং ঘোড়ার উপর বসে অন্যপথে চলে যেতে পারি। পারবেন কি আপনি? ভয়ের কিছু নেই। ঘোড়া শিক্ষিত, কিছু বলবে না আপনাকে।"

উনি তো বললেন—কিছু বলবে না! কিন্তু আমার সাহস হয় কই? যদি আমাকে দেখে শিক্ষিত ঘোড়াও মূর্খের মত আচরণ করে বসে? আমার দ্বিধাগ্রস্ত ভাব ভদ্রলোকের দৃষ্টি এড়াল না। একটু যেন বিরক্তভাবেই বললেন—"আপনার ভয় হচ্ছে, বুঝতে পেরেছি। তাহলে আমাকে সাহায্য করার ঐ এক উপায়ই আছে। আমাকে ধরে তুলুন, এবং ধরে নিয়ে চলুন ঐ ঘোড়া পর্যন্ত। তা ছাড়া আর তো কোন পথ দেখি না! কষ্ট হবে আপনার খুব।"

এ কথার আর উত্তর দিলাম না, ওঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। উনি প্রথমে হাত ধরে আস্তে পায়ের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠলেন একটু, তারপর আমার কাঁধ ধরে অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। সে কী বিষম আকর্ষণ! আমি পড়ে যাই আর কি!

যা হোক, পড়ে আমি গেলাম না। উনি আমার কাঁধ ধরে ধরে এক পায়ে লেংচে লেংচে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে চললেন। কী লম্বা লোক। তাঁর কাঁধের নীচে পড়েছে আমার মাথা।

ঘোড়ার পিঠে হাত দিয়েই তিনি অপূর্ব কৌশলে অনায়াসে তার উপর উঠে বসলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন— "ধন্যবাদ! আপনার পরিচয় জানতে পারি?"

"আমি থর্নফিল্ডে থাকি—"

"থর্নফিল্ডে?"—খুবই বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন।

"ওখানে আমি শিক্ষয়িত্রী।"

"ও-হো-হো! শিক্ষয়িত্রী! বটে, বটে!"—এই বলে আর দ্বিতীয় কথা না বলে পাশ কাটিয়ে ঘোড়া ছোটালেন ভদ্রলোক। আমি অবাক্। এ কী রকম ভদ্রতা! শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে কি এই রকম সম্ভাষণ করাই ভদ্রসমাজের রীতি? এ লোকটি যে ভদ্রলোক, এবং বিশিষ্ট একজন ভদ্রলোক, তাঁর প্রায়-অভদ্র কথাবার্তা শুনেও তাতে আমি সন্দেহ করতে পারলাম না।

ভাবছি আর পথ চলছি। নদী পেরিয়ে ফিরে চলেছি থর্নফিল্ডে। সন্ধ্যা হয়-হয়।

বাড়ির সমুখে আসতেই লক্ষ্য করলাম অনেকগুলো ঘরে আলো জ্বলছে, যা কোনদিন জ্বলে না। ব্যাপার কী?

ভিতরে ঢুকে দেখলাম—চাকরদাসীদেরও ত্রস্তভাব, এমন কি স্বয়ং মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সেরও। সদরের দিকে একখানা গাড়ি। গাড়িখানা আমার চেনা। এ অঞ্চলের একমাত্র ডাক্তার কার্টারের গাড়ি এটি। কার আবার অসুখ করল এরই মধ্যে? যখন বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, ডাক্তার দেখাবার মত অসুখ তো কারও ছিল না।

মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সের দিকে জিজ্ঞাসুভাবে তাকাতে তিনি বললেন—"মালিক এসেছেন, মিস্টার রস্টার।"

"ও! মালিক এসেছেন। তা, ডাক্তার কেন?"

"আসতে তাঁর একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল কিনা"—

কী দুর্ঘটনা, তা আর আমায় জিজ্ঞাসা করে জানতে হল না। আগুনের ধারে একটা প্রকাণ্ড কুকুর আরামে চোখ বুজে শুয়েছিল এতক্ষণ, আমি লক্ষ্য করি নি। হঠাৎ সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে লম্বা লম্বা পায়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমি চিনলাম। এ সেই নদীর ধারের বাবা কুকুর।

আমি ওর মাথায় হাত রাখতেই ও ঘড়ঘড় আওয়াজ করে ধন্যবাদ জানাল একটু। মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স আশ্চর্য হয়ে বললেন—"কী রকম? পাইলট তোমাকে চেনে নাকি?"

বেঁচে গেলাম। প্রশ্নটার উত্তর আর দিতে হল না। ডাক্তার চলে যাচ্ছেন, মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গেলেন। আমি এই অবসরে একেবারে উঠে গেলাম লাইব্রেরি ঘরে। আদেলি তখনও আসে নি পড়তে।

* * *

মিস্টার রস্টারের আঘাত গুরুতর নয়, তবে বেশ কিছুদিন তাঁর নড়াচড়া বন্ধ থাকবে। অন্ততঃ ডাক্তারের নির্দেশ তাই। মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স ঘাড় নেড়ে বললেন—"ডাক্তারের নিষেধ মানবার পাত্রই বটে উনি!"

নিষেধ মানবার পাত্র যে উনি নন, তা পরের দিনই বোঝা গেল। আদেলির পড়ার ঘর আলাদা হয়ে গিয়েছে। লাইব্রেরিতে এখন মালিকের অধিষ্ঠান—ক্রমাগত বাইরের লোক আসছে সেখানে। উপরের একটা ঘরে আগুন জ্বালা হয়েছে। বইপত্র সেখানে নিয়ে আমি পড়ার আসর গুছিয়ে ফেললাম।

সকাল বেলাতেই টের পেলাম—থর্নফিল্ড হলে পরিবর্তন ঘটেছে। একঘণ্টা আধঘণ্টা পরে পরেই দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠছে, নতুন নতুন পায়ের শব্দ, নতুন নতুন গলার আওয়াজ। গৃহে যে একজন গৃহস্বামী আছেন, তা বেশ উপলব্ধি হয়। আমার এটা ভালই লাগল।

আদেলিকে আজ পড়তে বসানোই শক্ত হয়েছে। মন দিতে পারছে না মোটেই। ক্রমাগত দৌড়ে দৌড়ে দরজার কাছে যাচ্ছে, রেলিং দিয়ে ঝুঁকে পড়ছে, যদি মিস্টার রস্টারকে এক পলকও দেখা যায়। তা যখন গেল না, সে নানা অছিলা বার করতে লাগল, নেমে

লাইব্রেরিতে যাওয়ার। আমি এতে রেগে উঠলাম। তখন সে চুপ করে বসল বটে, কিন্তু পড়ার বদলে কল্পনায় মেতে রইল। মিস্টার রস্টার তার জন্য কী কী এনেছেন, তারই কল্পনা। আদেলির জন্য কিছু না এনে তিনি যে বাড়ি আসবেন না, এটা সে নিশ্চিত জানে।

আদেলি আর আমি মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সের সঙ্গে বসে খেলাম। বিকালবেলায় আজ জোর হাওয়ার সঙ্গে অল্প অল্প বরফ পড়ছে, আমরা পড়ার ঘরেই সময় কাটালাম। সন্ধ্যা হয়ে আসতেই আমি আদেলিকে নীচে নামতে অনুমতি দিলাম। লোকজনের যাতায়াত বন্ধ হয়েছে। মিস্টার রস্টার বোধ হয় এখন একাই আছেন, আদেলি যদি যায়, তিনি বিরক্ত না হতে পারেন।

আদেলিকে নীচে পাঠিয়ে আগুনের কাছে বসলাম। ছাই ছড়িয়ে পড়েছে আগুনের পাশে, তারই উপর একটা নকশা আঁকতে লাগলাম আঙুল দিয়ে। রাইন নদীর কূলে হিডেলবার্গ দুর্গ, তারই ছবি দেখেছি সেদিন একটা পত্রিকায়। যতদূর মনে আছে, সেই দুর্গেরই নকশা আঁকছি—মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স এসে বললেন—"তুমি আর আদেলি যদি মিস্টার রস্টারের সঙ্গে চা পান কর, তিনি খুশী হবেন। সারাদিন এত ব্যস্ত ছিলেন যে তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে পারেন নি।"

জিজ্ঞাসা করলাম—"তিনি কখন চা খান ?"

"ছ'টায়। পোশাকটা বদলে নাও এখুনি।"

"পোশাক বদলানো কি নিতান্তই দরকার ?"

"তা বদলানো ভাল। উনি সব ছিমছাম দেখতে পছন্দ করেন। উনি বাড়িতে থাকলে, সন্ধ্যাবেলায় আমিও সাজপোশাক করি।"

বাপ্! এ যে রাজকীয় আদবকায়দা! যা হোক, ঘরে গিয়ে মামুলী ফ্রকটা ছেড়ে একটা কালো রেশমী পোশাক পরা গেল। মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স সঙ্গে এসেছিলেন, তিনিই বেঁধে ছেঁদে দিলেন। মিস্ টেম্পল একটি মুক্তোর ব্রুচ উপহার দিয়েছিলেন বিদায়কালে, সেইটি পরলাম কালো পোশাকের উপর, তারপর নামলাম নীচে।

অপরিচিত লোকদের সামনে তো কোনদিন বেরুনো অভ্যাস নেই, তাই একটু আড়ষ্ট বোধ করছিলাম। মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স আগে আগে যাচ্ছেন, আমি তাঁর পিছনে, তাঁর ছায়ার আড়ালে।

খাওয়ার ঘর পেরিয়ে ওর পিছনের খুপরিটাতে ঢুকলাম। ভারী

পর্দা দিয়ে খুপরিটা আলাদা করা। গনগনে আগুন জ্বলছে, পাইলট শুয়ে আছে সেই আগুনের কাছে, আর পাইলটের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে আদেলি। একখানা কৌচের উপরে মিস্টার রস্টার আধ-শোয়া অবস্থায় আরাম করছেন। ভাঙ্গা পা-খানা তোলা রয়েছে একটা গদির উপরে। পাইলট আর আদেলির দিকে তাঁর দৃষ্টি। অগ্নিকুণ্ডের আভায় তাঁর মুখ-খানা উজ্জ্বল। গতকালের পথিক ভদ্রলোককে চিনতে কষ্ট হল না। চওড়া ভ্রূ, চৌকো কপাল, উপরপানে ঠেলে-তোলা কালো চুল, নাক-মুখ-চোয়াল সব কিছু মিলে একটা উগ্রস্বভাবের আভাস দিচ্ছে। সৌন্দর্যের বালাই সে চেহারায় নেই। গায়ে আঁটো জামা একটা, দেহের গঠন বেশ ধরা যায়। চওড়া বুক, সরু কোমর—সে-গঠনে লালিত্য নেই, রয়েছে পুরুষালি সৌষ্ঠব।

আমরা দুটি প্রাণী যে ঘরে ঢুকেছি, তা তাঁর টের না পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু দেখা গেল, আমাদের উপস্থিতিকে আমল দেওয়ার মত মেজাজ তাঁর নেই বর্তমানে। মাথা তুলে তাকালেনও না।

শান্তস্বরে মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স বললেন, "মিস্ আয়ার এসেছেন।" উনি ঈষৎ মাথাটা নীচু করলেন, কিন্তু পাইলট আর আদেলির দিক্ থেকে দৃষ্টি ফেরালেন না। "মিস্ আয়ার বসুন"—এইমাত্র তাঁর সম্ভাষণ। আর কী নীরস সে সম্ভাষণের সুর ! ওর অর্থ স্পষ্টতঃই এই রকম—'মিস আয়ার আসুন আর না আসুন, বয়ে গেল আমার, এখন কথা কইতে পারব না।'

একটুও বিব্রত না হয়ে আমি চেপে বসলাম। খুব বেশী ভদ্রতা করে উনি যদি কথা কইতেন, তাতেই বোধ হয় আমি বিব্রত বোধ করতাম। উদাসীন ব্যবহারের জবাবে আমিও উদাসীন হতে পারব, সেটা একটা সুবিধা। তা ছাড়া, ভাবলাম দেখাই যাক না, এ অদ্ভুত আচরণের পরিণতি কী দাঁড়ায়।

তিনি প্রস্তরমূর্তির মত বসে আছেন, কথা কইছেন না, নড়ছেন না। মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স বোধ হয় ভাবলেন—অবস্থাটা বিসদৃশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তিনি নিজেই কথা শুরু করলেন—"আহাহা, সারা দিন এত লোকের আনাগোনা, মালিকের কী ঝামেলাই গিয়েছে! তার উপর পা-খানা জখম! কী আশ্চর্য ধৈর্য আর সহিষ্ণুতা মালিকের!" ইত্যাদি ইত্যাদি—।

এত কথার উত্তরে শুধু একটি উক্তি শোনা গেল—"একটু চা পেলে হত।"

মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স তাড়াতাড়ি ঘণ্টা বাজালেন। চায়ের ট্রে এল, তিনি কাপ, চামচ—সব তাড়াতাড়ি সাজিয়ে ফেললেন। আদেলি আর আমি টেবিলের কাছে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু মালিক কৌচ থেকে উঠলেন না।

"তুমিই ওঁর কাপটা হাতে তুলে দাও না?"—আমাকে অনুরোধ করলেন ভদ্রমহিলা—"আদেলি হয় তো ফেলে দেবে।"

আমি পেয়ালা তুলে দিলাম মালিকের হাতে, বাচাল আদেলি বলে উঠল—"আপনি মামোয়াজেল আয়ার-এর জন্য উপহার কিছু আনেন নি?"

"উপহার?" মিস্টার রস্টার বিরস কণ্ঠে বললেন—"উপহার আবার কী? মিস্ আয়ার! আপনি কী উপহারের আশা করেছিলেন? উপহার ভালবাসেন নাকি?" এতক্ষণে তাঁর চোখের দৃষ্টি আমার উপর পড়ল—অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, ক্রোধন দৃষ্টিও বলা চলে।

আমি জবাব দিলাম—"ভালবাসি কিনা, বলা কঠিন। কদাচিৎ পেয়েছি কি না উপহার! তবে সাধারণতঃ লোকে উপহার পেলে খুশী হয় বোধ হয়?"

"লোকে খুশী হয়? আপনি খুশী হন কি না?"

"একটু না ভেবে বলতে পারছি না। উপহারের অনেক রকম অর্থ হয়, কী বলেন? অর্থ-বিচার করে বলা যায় না, তাতে খুশী হওয়া উচিত, না অখুশী—।"

"মিস্ আয়ার! আদেলির মত সরল নন আপনি। ও কেমন উপহারের জন্য চেঁচামেচি করে আবদার জানায়। আর আপনি—অকারণ চারদিক হাতড়াচ্ছেন।"

"স্বাভাবিক। আদেলির যোগ্যতা আছে উপহার পাওয়ার। আপনার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয় তার, তা ছাড়া আপনি নাকি বরাবরই এটা ওটা দিয়ে আসছেন তাকে, তার কাছেই শুনেছি। কিন্তু আমার কথা বলতে গেলে, আমি তো ভেবেই পাই না, আপনার কাছে কী কারণে আমি উপহার পেতে পারি। আমি তো সম্পূর্ণ অচেনা আপনার। এমন কিছুই করিও নি—যার দরুন—"

"না, না, অতি বিনয়ী হতে যাবেন না। আদেলিকে পরীক্ষা করে দেখলাম—ওর জন্য যথেষ্ট খেটেছেন আপনি। ওটা কিছুই জানত না, বুদ্ধিশুদ্ধি ওর নেই, তবু বেশ খানিকটা শিখেছে।"

"বাঃ, এই তো উপহার হয়ে গেল মহাশয়! আমি বাধিত। এর চেয়ে ভাল উপহার কোন শিক্ষক বা শিক্ষিকা প্রত্যাশা করে না। ছাত্র-ছাত্রী উন্নতি করেছে, এই স্বীকৃতি হল শিক্ষক-শিক্ষিকার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।"

"হুঁ"—বলে মিস্টার রস্টার নীরবে চা-পানে মন দিলেন।

চায়ের সরঞ্জাম যখন সরিয়ে নিয়ে গেল, মালিক হুকুম করলেন—"সরে আসুন আগুনের দিকে।" মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স এক কোণ অধিকার করে বসলেন তাঁর সেলাই নিয়ে, আদেলি এসে আমার কোল জুড়ে বসতে চাইছিল, কিন্তু তার উপর হুকুম হল, "পাইলটের সঙ্গে খেলা কর গিয়ে।" তারপর প্রশ্ন—

"আমার এখানে তিন মাস আছেন আপনি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—

"কোথা থেকে এলেন?"

"—শায়ারের লোউড স্কুল থেকে।"

"দাতব্য শিক্ষালয়। কত দিন ছিলেন ওখানে?"

"আট বছর।"

"আ—ট বছর? আপনার খুব কড়া জান তো তাহলে। ওর অর্ধেক দিন ওখানে কেউ বাঁচতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না। যা হোক, মরে যান নি বটে, কিন্তু আকৃতিটা প্রায় মরার মতই হয়েছে। কাল যখন হে লেন-এ, ঐ জায়গাটাকে হে লেন বলে—জানেন না বোধ হয়?—যেখানে সন্ধ্যাবেলায় কাল দেখা হল—হঠাৎই মনে হল—ভিন্ন জগতের কাউকে দেখছি। আছাড় খেয়ে পড়ার পরেও মনে হল—আপনিই জাদু করেছেন আমাকে। সে ধারণা এখনও ঘোল আনাই যায় নি অবশ্য।"

হঠাৎ কথার স্রোত থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আপনার বাপ-মা কোথায়?"

"নেই"—

"কোনদিন ছিলেন তো? মনে পড়ে তাঁদের?"

"উহু"—

"না থাকারই সামিল, মানে কোনদিনই যে ছিলেন, তার প্রমাণ কী? তাহলে কাল সন্ধ্যাবেলায় বসে নিজের জাতগোত্রদের প্রতীক্ষায় ছিলেন বলুন!"

"জাতগোত্র?"

"সবুজ পোশাক পরে যে-সব পরীরা আসে চাঁদনি রাতে বনের ভিতর নাচতে, তাদের অদৃশ্য জমায়েতের মাঝখানে এসে পড়ার দরুনই বোধহয় এই পা-খানা ভেঙে দিলে তারা।"

মাথা নেড়ে বললাম—"পরীর নাচ আর এদেশে হয় না, একশো বছর আগে শেষ পরী ইংলণ্ড ত্যাগ করেছে। হে লেন বলুন, আর তার আশপাশের বনবাদাড় বলুন, তাদের কোন চিহ্ন আর কোথাও পাবেন না এ-যুগে।"

মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স-এর হাত থেকে সেলাই খসে পড়েছে। ভদ্রমহিলা অবাক্ হয়ে ভাবছেন বোধ হয়—এ আবার কী-ধরনের কথাবার্তা!

মিস্টার রস্টার এবার বৈষয়িক কথায় নামলেন—"যাক বাপ-মা না হয় নেই, অন্য আত্মীয়স্বজন তো আছে! খুড়ো জেঠা মেসো পিসে খুড়ী জেঠী—"

"কাউকেই দেখিনি কোনদিন।"

"বাড়ি কোথায় তাহলে?"

"বাড়ি তো নেই!"

'আঃ, আপনার ভাইয়েরা, বোনেরা—কোন এক জায়গায় থাকেন তো?"

"ভাইবোন তো নেই!"

"বাঃ, এখানে আসবার সময় কার সুপারিশ নিয়ে এসেছিলেন?"

"বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, তারই উত্তরে মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স—"

এইবার মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স হালে পানি পেলেন। "ঠিক কথাই বলেছে জেন। ভগবান আমায় সুমতি দিয়েছিলেন, তাই বাছাই করে করে ওকেই আমি ডেকে পাঠিয়েছিলাম। মিস্ আয়ারকে যে পেয়েছি, খুব জোর বরাত আমাদের। আমি পেয়েছি একটা কথা কইবার মানুষ, আদেলি পেয়েছে—মানে, অমন স্নেহশীলা অথচ কর্তব্যপরায়ণা শিক্ষিকা—"

"থাক, থাক, আর অত প্রশংসাপত্র না দিলেন!" বাধা দিলেন মিস্টার রস্টার। "পরের মুখে ঝাল আমি খাই না। নিজে দেখে বিচার করব। কাল ওঁর সঙ্গে দেখা হতেই আমায় আছাড় খাইয়েছেন।"

"বলেন কী?"—মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স অবাক্।

"এই যে ভাঙ্গা পা, এ ওঁরই হাতযশ।"

মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স হতভম্ব।

"মিস্ আয়ার, কখনো কোন শহরে বাস করেছেন?"

"আজ্ঞে না।"

"সমাজে মিশেছেন কখনও?"

"লোউডের শিক্ষিকা আর ছাত্রীদের সঙ্গে মিশেছি, আর এখন মিশছি থর্নফিল্ডের বাসিন্দাদের সঙ্গে।"

"পড়াশুনা কতদূর কী করেছেন?"

"যেসব বই পেয়েছি, পড়েছি। বেশী নয়, খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণও নয়।"

"অর্থাৎ সন্ন্যাসিনীর জীবনযাপন করেছেন এতদিন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খুব পাকা বোধ হয়? লোউডের পরিচালক ব্রকলিহার্স্ট তো পাদরী, নয়?"

"তা বটে!"

"ব্রকলিহার্স্টকে খুব ভক্তি করতেন আপনারা, কী বলেন?"

"ব্রকলিহার্স্ট? না, না, মোটেই না।"

"কী রকম? পরিচালক! পাদরী! ধর্মগুরু! তাকে ভক্তি করতেন না? সে যে মহাপাপ! ঠাণ্ডা মাথায় বলছেন এই কথা!"

"তা বলছি। ভক্তি মরুক গিয়ে, ভদ্রলোককে অপছন্দই করতাম। আমি যে একাই করতাম, তাও নয়। লোকটির মেজাজ রুক্ষ। গ্রামভারী স্বভাব, সবকিছুতেই নাক গলানো চাই। আমাদের চুল কেটে দিয়েছিল মশাই! খরচা বাঁচাবার জন্য এমন ছুঁচ-সুতো কিনে দিত, যা দিয়ে সেলাই করাই চলত না।"

মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স কথা বলবার সুযোগ পেলেন একটা—"ওভাবে খরচা বাঁচাবার চেষ্টা করা ভুল।"

রস্টার বললেন—"ভদ্রলোকের দোষ কি ঐটুকুই? না, আর কিছু আছে?"

"যতদিন কমিটি হয় নি, ওঁর হাতে ভাঁড়ার ছিল, উনি না খেতে

দিয়ে শুকিয়ে মেরেছেন আমাদের। হপ্তায় একদিন করে রাত্রিবেলায় উনি ধর্মোপদেশ দিতেন। সে-উপদেশ আগাগোড়া অপঘাত মৃত্যু আর নরক-যন্ত্রণার বিভীষিকায় ভরা। রাত্রে ঘুমুতে পারতাম না ভয়ে।"

"লোউডে যখন এসেছিলেন, বয়স তখন কত?"

"দশ।"

"তারপর আট বছর ওখানে ছিলেন। এখন আপনার তাহলে আঠারো বছর বয়স।"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"দেখলেন তো, অঙ্ক জানি। না জানলে, আপনার বয়স যে আঠারো, তা আপনাকে দেখে অনুমান করব, এমন শক্তি আমার ছিল না। যাক, লোউডে শিখলেন কী? গান বাজনা জানেন?"

"সামান্য।"

"সবাই ঐ কথাই বলে—'সামান্য'। যাক, লাইব্রেরি ঘরে পিয়ানো আছে, বাজান দেখি। অর্থাৎ অনুগ্রহ করে বাজান যদি, আমি খুশী হব। কথাটা হল কি, জানেন? কথা বলার ভঙ্গী আমার স্বভাবতঃ অভদ্র। ওটা ক্ষমা করে নেবেন।"

কয়েক মিনিট পরেই হেঁকে উঠলেন—"হয়েছে, হয়েছে। যা বলছিলেন, 'সামান্য'ই বাজাতে জানেন, দেখতে পাচ্ছি। কারও কারও চেয়ে ভাল হয় তো, কিন্তু মোটের উপর ভাল নয়।"

পিয়ানো বন্ধ করে ফিরে এলাম। মিস্টার রুস্টার বলতে লাগলেন—"আদেলি কতগুলি ছবি দেখাচ্ছিল আমাকে। বলছিল আপনার আঁকা। সত্যিই যদি ষোল-আনা আপনারই আঁকা হয়, মাস্টার মশাইয়ের সাহায্য নিয়ে আঁকা যদি না হয়—"

বাধা দিয়ে বললাম—"নিশ্চয়ই না—"

"তাহলে ওগুলি একবার নিয়ে আসুন না!"

দেখে দেখে তিনখানি ছবি আলাদা করে রাখলেন। অনেকক্ষণ ধরে দেখে বললেন—"অনেক সময় লেগেছে, ভাবতেও হয়েছে অনেকখানি। এত সময় পেলেন কী করে?"

"লোউডে শেষ দু বছর লম্বা ছুটির সময়। অন্য কাজও তখন ছিল না!"

"কী দেখে আঁকলেন?"

"কিছু দেখে নয়, মাথা থেকে।"

"ঐ যে আপনার ঘাড়ের উপর একটি মাথা রয়েছে, ঐ মাথা ?"

"তা বইকি !"

একবার এটা, একবার ওটা দেখতে দেখতে কতকটা আমাকে সম্বোধন করে, কতকটা-বা নিজের মনে তিনি বলে চললেন—"না, একেবারে যে কিছুই হয় নি, এমন কথা বলা যায় না। মনের ভাবের একটা আভাস ফুটেছে বইকি ছবিতে ! তবে, আভাসের চাইতে বেশী কিছু নয়। কোথা থেকে হবে ? তার জন্য দরকার ছিল শিক্ষা। ওর কৌশল আছে, পদ্ধতি আছে, রীতি আছে। কিন্তু সে কথা থাকুক, এমন ভুতুড়ে ভাব আপনার মনে কোথা থেকে এল ? সন্ধ্যাতারার ভিতরে দুটো চোখ এঁকেছেন। ও চোখ এত স্পষ্ট অথচ এমন অনুজ্জ্বল কেন ? ঐ চোখের গভীরতার ভিতর থেকে উৎসারিত হচ্ছে কোন্ অনুক্ত ভাষা ? হাওয়া আঁকতে আপনাকে শেখালে কে ? এ আকাশে তো প্রচণ্ড ঝড় বইছে দেখছি। এই পাহাড়ের চূড়াতেও। ল্যাটমস তো দেখেন নি, কিন্তু ল্যাটমসকে আঁকলেন কেমন করে ? এ তো ল্যাটমস নিঃসন্দেহে !"

হঠাৎ থেমে গিয়ে ছবিগুলো ঠেলে রাখলেন। তারপর অবসন্নভাবে বললেন—"শুভরাত্রি ! আপনারা বিশ্রাম করুন গিয়ে। ন'টা বেজে গিয়েছে।"

* * *

আদেলিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসে মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সের ঘরে বসলাম। চুপি চুপি বললাম—"হঠাৎই মেজাজ পালটে যায় দেখছি —মিস্টার রস্টারের। বেশ একটু খেয়ালী।"

মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স বললেন—"তাই নাকি ? আমি অনেক দিন থেকে দেখছি, আমার চোখ-সওয়া হয়ে গিয়েছে বোধ হয়। তবে খেয়ালী হওয়ার কারণ আছে ওঁর। বহু দুশ্চিন্তা রয়েছে তো !"

"দুশ্চিন্তা ? কিসের ?"

"এই ধর না কেন, সাংসারিক বিপদ-আপদ !"

"সংসারই নেই, তো সাংসারিক বিপদ !"

"আঃ, এখন নেই বলে কি কোনদিনই ছিল না ? বড় ভাই মারা গেলেন কয়েক বছর আগে।"

"বড় ভাই ছিল নাকি ওঁর ?"

"তা ছিল। ইনি তো বিষয়ের মালিক হয়েছেন মোটে ন' বছর।"

"তা, ন' বছর তো কম সময় নয়! ভাইকে কি এতই ভালবাসতেন যে ন' বছরেও তাঁর শোক সামলাতে পারলেন না?"

"না, সে কথা নয়। ভালবাসা নয়, ঠিক উলটো। আমার মনে হয় ওঁদের ভিতর মন-কষাকষি ছিল কিছু। ওঁর দাদা ঠিক সুবিচার করেন নি ওঁর উপরে। পিতাকে বিগড়ে দিয়েছিলেন ছোট ভাইয়ের সম্বন্ধে। বুড়ো রস্টার টাকা জিনিসটাকে ভালবাসতেন একটু বেশী মাত্রায়। সম্পত্তি দু ছেলের ভিতর ভাগ করে দিলে দুজনই গরিব হয়ে যাবে, সুতরাং ভাগাভাগি তিনি করেন নি, সমস্ত সম্পত্তিই দিয়ে গিয়েছেন বড় ছেলে, রোল্যাণ্ডকে। আবার ছোট ছেলে এডওয়ার্ডও গরিব হয়ে যাক, এটা তাঁর পছন্দ ছিল না। তাকে বড়লোক করে দেবার একটা ফন্দি করেছিলেন বৃদ্ধ। কী সে ফন্দি, আমি ঠিক জানি না, তবে শুনেছি বাপের সেই ফন্দির ফাঁদে পড়ে এই এডওয়ার্ড মশাই খুব কষ্ট পেয়েছিলেন কিছুদিন। সে কষ্ট হয়ত এখনও তাঁর মন থেকে যায় নি! আর সেইজন্যই বোধ হয় তিনি থর্নফিল্ডে স্থায়ী হয়ে থাকতে পারেন না।"

"কেন? কবে কী কষ্ট পেয়েছিলেন, তার জন্য থর্নফিল্ডে বাস করা আটকাবে কেন?"

"মন খারাপ হয়ে যায়। হয়ত পূর্বস্মৃতিতে, বা অন্য কোন কারণে। সঠিক তো জানি না, বলব কেমন করে?"

বুঝলাম যে মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স সরলভাবে কথা কইছেন না, চাপা দিচ্ছেন কোন একটা ব্যাপার। যাই হোক, এ বিষয়ে আর বেশী আলোচনা করতে তাঁর ইচ্ছে নেই বলে মনে হল। কাজেই আমিও ছেড়ে দিলাম সে আলোচনা।

পরে জেনেছিলাম সবই। মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স হয়ত নিজের কর্তব্যই করেছিলেন আমার কাছে পূর্বকাহিনী গোপন করে। কিন্তু যদি তা গোপন তিনি না করতেন, অনেক দুঃখ আর অনেক গ্লানির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যেত এই দীন দরিদ্র গৃহশিক্ষিকা—জেন আয়ার।

পাঁচ

দিন কেটে যায়। মিস্টার রস্টারের সঙ্গে রোজই যে দেখা হয়, বা দেখা হলেই যে তিনি হেসে কথা বলেন, তা নয়। লোকজন প্রায়ই আসে তাঁর কাছে বৈষয়িক ব্যাপারে। ভাঙ্গা পা জোড়া লাগবার পরে তিনিও ঘোড়ায় চড়ে চলে যান প্রতিবেশীদের বাড়িতে, পালটা দেখা-শোনার জন্য। কাজেই, আমি তো সামান্য লোক, মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সও অনেক দিনই তাঁকে দেখতে পান না।

হয়ত দেখা হলই। বারান্দায় যাতায়াতের পথে বা সিঁড়ির মুখে। হয়ত তিনি দেখেও দেখলেন না বা সামান্য একটু মাথাটা হেলিয়েই চলে গেলেন, যেন চেনেনই না। আমি তাতে কিন্তু একটুও দুঃখ পাই না! কেন পাব? লোকটি খেয়ালী। তাতে তাঁর অনেক কাজ, মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স বলেছেন অশান্তিও অনেক। কাজেই মেজাজ তাঁর রুক্ষ থাকা স্বাভাবিক। রুক্ষ মেজাজ নিয়েও যে বাইরে হাসিখুশী ভাব দেখাতে পারে, তাকে বাহবা দিতে হয়। কিন্তু ইনি সে ধরনের লোক নন। কাজেই, আমার সঙ্গে হেসে কথা কইছেন না দেখে আমার দুঃখবোধ করবার কোন হেতু নেই। বিরক্তি যখন তাঁর জন্মে, সারা পৃথিবীর উপরেই জন্মে, বিশেষ করে আমার উপরে নয়।

কিন্তু এমনও এক একদিন ঘটে—যে দেখা হওয়া-মাত্র তিনি হাসিমুখে মিষ্টি সম্ভাষণ করলেন, বা সন্ধ্যার সময় আদেলিকে ও আমাকে তাঁর বসবার ঘরে ডেকে পাঠালেন। পরে অবশ্য মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সও আহ্বান পেলেন একটা, ভদ্রতার খাতিরে। সেদিন—কী জানি কেন, আমার মনটা অকারণেই উৎফুল্ল হয়। আদেলিকে মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সের কাছে ভিড়িয়ে দিয়ে তিনি আমাকে কাছে ডেকে বসান, কথা শুরু করেন নানা বিষয়ে। ব্যক্তিগত কথাও বাদ যায় না। লোকটি খেয়ালী, খেয়াল জাগলে শালীনতার সীমা ছাড়িয়েও প্রশ্ন করেন। যথা—একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—"জেন! আমায় কি তুমি সুপুরুষ মনে কর?"

"না তো।" অম্লান বদনে উত্তর দিলাম আমি। তিনি যদিও খেয়ালী, আমি স্পষ্টবাদী।

"না?" তিনি যুগপৎ অবাক্ এবং রুষ্ট—"কেন? আমার চেহারা সম্বন্ধে কোন্‌খানটাতে আপত্তি তোমার? এই কপাল—" মাথার চুল উপর দিকে ঠেলে তুলে তিনি দেখালেন—"এই কপাল কি প্রশস্ত, সুগঠিত নয়?"

"তা প্রশস্ত তো বটেই, সুগঠিতও বলা যায়।"

"এই চিবুক—এই নাক—এই ওষ্ঠ—কোন্‌টাতে আপত্তি তোমার? আর আপত্তি থাকলেই কি মুখের উপর একটা লোককে সে আপত্তির কথা বলা চলে? এই রকম শিক্ষাই কি পেয়েছিলে লোউডে আট বছর বসে?"

আমি আর চেহারার খুঁটিনাটি বিচারের ভিতর ভিড়লাম না। ওঁর অভিযোগের শেষাংশ নিয়ে আলোচনা শুরু করলাম—"মুখের উপর কাউকে কুশ্রী বলা উচিত নয়—এটা মানি। বলা উচিত যে মানুষের চেহারা সম্বন্ধে হঠাৎ মন্তব্য করা নিরাপদ নয়, বলা উচিত যে বিভিন্ন লোকের রুচি বিভিন্ন, বলা উচিত যে পুরুষের (এবং নারীরও) রূপ থাকুক বা না থাকুক, তাতে আসে যায় কী? গুণই হল আসল জিনিস। হ্যাঁ, এইরকম ভাবে ভাষার মারপ্যাঁচের আড়ালে মনের ভাব গোপন করাই যে সভ্যসমাজের রীতি, সে শিক্ষা আমি লোউডেও পেয়েছি। তা সত্ত্বেও যদি সত্য কথা বলার সাহস পেয়ে থাকি তো জানবেন যে অপ্রিয় সত্য সহ্য করবার শক্তি ও উদারতা আপনার আছে মনে করেই আমি তা পেয়েছি।"

কথা আর বেশী বাড়তে পেল না। আদেলি হঠাৎ ছুটে এসে কী একটা খেলনা দেখাতে লেগে গেল মিস্টার রস্টারকে। এই মেয়েটিকে সত্যি সত্যি যে ভালবাসেন উনি, তা তো আমার মনে হয় না, আকারে ইঙ্গিতে বলেওছেন সে কথা। ওঁর আপন কেউ নয়, এক সময়ে পরিচয় ছিল ওর মায়ের সঙ্গে। সে মা ভাল ব্যবহার করে নি ওঁর সঙ্গে তবু সে মরে যাওয়ার পরে মেয়েটা নিরাশ্রয় হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে জেনে ফরাসীদেশ থেকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন এবং স্নেহ দিয়ে যত না হোক, আর্থিক সাহায্য এবং তত্ত্বাবধান দিয়ে তার শৈশবকে নিরাপদ করে দিয়েছেন, এটাকে ওঁর বদান্যতা না বলে উপায় নেই।

মিস্টার রস্টারকে যতই দেখছি, ততই ভাল লাগছে।

একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন—"আমার অভদ্রতাগুলো তুমি ঠিক মার্জনা করে নিতে পারছ'ত জেন?"

আমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"অভদ্রতা?"

"অভদ্রতা ছাড়া আর কী? এই তো তোমাকে মিস্ আয়ার না বলে 'জেন' বলে সম্বোধন করছি। 'আপনি' না বলে 'তুমি' বলছি। কথা বলার সময়ে 'দয়া করে', 'অনুগ্রহ করে' প্রভৃতি ভদ্রতার বয়ানগুলো ছেঁটে দিয়েছি ছ'দিনের আলাপেই। হুকুমের সুরেই কথা বলি সর্বদা, এ সব যদি অভদ্রতা না হয়—"

"হুকুম করবার অধিকার যার আছে, সে হুকুমের সুরে কথা না কইবে কেন?" আমি হাসিমুখেই বললাম।

"হুকুমের অধিকার?" মিস্টার রস্টার খুবই অবাক্।

"যাকে ত্রিশ পাউণ্ড বেতন দিচ্ছেন বছরে, তাকে হুকুম করবার অধিকার যে আছে আপনার, তা তো সবাই স্বীকার করবে!"

"বেতন?" মাথায় হাত বুলোলেন মিস্টার রস্টার—"ও কথাটা আমার মনে ছিল না। তাহলে কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে বেতন পাচ্ছ বলেই আমায় তুমি হুকুমের সুরে কথা কইতে দেবে, না পেলে দিতে না।"

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—"কথা মোটেই সে রকম দাঁড়াচ্ছে না। মাইনে দিচ্ছেন বলে নয়, মাইনে দিয়েও সে কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন বলে আমি আপনার হুকুমের সুর সর্বদাই হাসিমুখে বরদাস্ত করব।"

"ও কি! তুমি চললে যে!"

"না গিয়ে পারব কেমন করে। রাত নয়টা বেজে গিয়েছে। আদেলির শোবার সময় হয়েছে যে! শুভরাত্রি!"

সেই থেকে বরফ ভেঙে গেল। দেখা হতে লাগল রোজই, শুধু সন্ধ্যার পর নয়, দিনের বেলাতেও। দুপুরবেলা আদেলিকে নিয়ে রোজই বাগানে বেড়ানো, কোন-কোনদিন খেলাধুলো করাও আমার অভ্যাস, সে সময়েও এক-একদিন মিস্টার রস্টার আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগলেন। দিন পরম আনন্দে কাটতে লাগল।

এই সময় একদিন ঘটল ভয়াবহ এক ঘটনা।

রাত্রে ঘুমিয়ে আছি। হঠাৎ সেই অট্টহাসি! যে হাসি মিস্টার রস্টার আসবার আগে দু একদিন গভীর নিশীথে শুনেছি। উঠে পড়লাম বিছানা থেকে। হাসি থেমে গিয়েছে। কিন্তু বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ। আমি তাড়াতাড়ি দরজায় খিল এঁটে দিলাম। তারপর ধরা গলায় বলে উঠলাম—"কে ওখানে?"

কোন উত্তর নেই। পায়ের শব্দটা সিঁড়ির দিকে চলে যাচ্ছে। এর আগেই মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সের কথায় ও ইঙ্গিতে আমার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়েছে যে চারতলার বাসিন্দা যে দরজী মেয়েটি আছে এ-বাড়িতে, গ্রেস্ পুল যার নাম –মদ খেয়ে অতিরিক্ত নেশা হলে সে এইরকম দানবীয় হাসি হাসে এক এক সময়।

গ্রেস্ পুলকে সে-রকম নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোনদিন দেখি নি আমি। দেখেছি অনেকবার, তাতে সন্দেহ নেই। ডিনার খেতে সে প্রায় রোজই নামে সন্ধ্যার আগে, অবশ্য সে খায় রান্নাঘরে অন্য দাসীদের সঙ্গে, আমি খাই মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সের খাওয়ার ঘরে তাঁর ও আদেলির সাথে। তাহলেও আসা-যাওয়ার পথে আমার চোখে সে পড়েই। আর, দেখা হলেই, হাসিমুখে না হোক, ভদ্রভাবে সে একটা সময়োচিত সম্ভাষণ জানাবেই। খুব খারাপ বা ভয়ানক লোক তাকে আমার মনে হয় না। অথচ সে এইরকম ভুতুড়ে হাসি হাসবে মাঝে মাঝেই, এ যেন কেমন বিশ্বাসে আসে না।

যা হোক, আমি ভাবলাম, আজ একবার ওর নেশাগ্রস্ত চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করা যাক। অনেকটা দূরে চলে গিয়েছে, হঠাৎ যদি আমার দিকে তেড়ে আসে, আক্রমণের চেষ্টা করে, আমি পালিয়ে এসে আবার খিল বন্ধ করার সময় অবশ্যই পাব।

দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরুলাম। কিন্তু, কী আশ্চর্য! বারান্দায় মেঝেতে একটা মোমবাতি জ্বলছে কেন? আর, জ্বলছে ঠিক পাশের ঘরের দরজার সামনে। ঐ পাশের ঘরটি হল মিস্টার রস্টারের নিজেরই শয়নকক্ষ। ও ঘরের সামনে মোমবাতি কে জ্বালাল এত রাত্রে? কেনই বা জ্বালাল?

সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম—কাউকেই দেখা যায় না। গ্রেস্ এতক্ষণ উপরে উঠে গিয়েছে তাহলে।

তা যাক, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে কেন?

মোমের আলোতে দেখছি—মিস্টার রস্টারের ঘরের দরজা ঈষৎ খোলা। আর সেই সামান্য ফাঁক দিয়ে ঘন কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে বারান্দায়। সেই ধোঁয়ার জন্যই নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ করছি আমি।

আমি চমকে উঠলাম। আগুন লেগেছে ও ঘরে! আর মিস্টার রস্টার জেগে যখন ওঠেন নি, তখন তিনি নিশ্চয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন ধোঁয়ার দরুন!

আমি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম না। ভালো-মন্দর বিচারের জন্যও না। গভীর নিশীথে আমার মত এক কুমারী নারীর মিস্টার রস্টার বা অন্য কোন পুরুষের কক্ষে প্রবেশ করা—যে কোন কারণেই হোক—দোষাবহ বলে যে গণ্য হতে বাধ্য সামাজিক আইন-কানুনে—সে চিন্তা আমার মাথায় ঠাঁই পেল না এক পলকেরও জন্য। আমি ছুটে গিয়ে, দরজা খুলে ফেললাম ও ঘরের।

যা ভেবেছি, তাই, ঘন কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। কোন আলো জ্বলছে না ঘরে, তবু দেখবার অসুবিধা নেই, কারণ আগুন বেশ ভাল ভাবেই ধরে উঠেছে। বিছানাটাতেই আগুন। মশারি জ্বলছে, চাদর জ্বলছে, আর সেই জ্বলন্ত কটাহের উপর মিস্টার রস্টার শুয়ে পড়ে আছেন—যেন গভীর নিদ্রার ঘোরে। আমি ডাক দিলাম দু একটা—"মিস্টার রস্টার! মিস্টার রস্টার!" কোন সাড়া নেই। অর্থাৎ, সাড়া দেওয়ার মত চেতনা নেই ভদ্রলোকের।

এক্ষুনি আগুন তাঁর দেহ স্পর্শ করবে। করল ঐ।

আমি ছুটে গেলাম ওদিককার কোণে। প্রতি শয়নকক্ষেই জলাধার থাকে তো একটা, প্রত্যূষের কৃত্যসম্পাদনের জন্য। ভাগ্যক্রমে তাতে জল আছে প্রচুর। জল তুলবার পাত্রও একটা রয়েছে। আমি সেই পাত্র জলে ডুবিয়ে ছুড়তে লাগলাম জল, বিছানা লক্ষ্য করে, মিস্টার রস্টারের দেহের অতি নিকটেই, যাতে আগুন তাঁকে ছুঁতে না পারে।

ঘটির পর ঘটি জল। ক্রমাগত ছুড়তে ছুড়তে বিছানার উপরকার আগুন নিভে এল। এদিকে ভদ্রলোকের সারা দেহও ভিজে গিয়েছে আপাদমস্তক। এখন ওঁকে জাগানোর চেষ্টা করা দরকার, তা নইলে নিউমোনিয়ার আক্রমণ থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না ওঁকে। কিন্তু—আমি ডাকি কখন? এখনও পালঙ্কের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে।

এঘরে জলও আর নেই। আমি দৌড়ে গেলাম নিজের ঘরে, সেখানকার জলটাও ঘটি ভরে ভরে এনে বিছানায় আর পালঙ্কে ঢাললাম। এক একবার জল নিয়ে আসি, আর "মিস্টার রস্টার, মিস্টার রস্টার" বলে দুটো ডাক দিই।

অবশেষে সে ডাকে সাড়া মিলল। আগুন নিভেছে। ধোঁয়া কেটে গিয়েছে, ওঁর চেতনা ফিরে এসেছে ধীরে ধীরে। আমার ডাক শুনে বিছানায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—"বান ডাকল নাকি ?"

আমি বলে উঠলাম—"বান নয়, আগুন ! আপনি উঠুন শীগগির।"

"আগুন !" ধড়মড়িয়ে উঠতে গিয়েই আবার বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন, "তুমি বাইরে যাও একটু, আমি একটা শুকনো কিছু গায়ে জড়িয়ে নিই। তুমি কি জেন আয়ার না কি ? এ কী কাণ্ড ? তুমি কোথা থেকে ? কেন ? কেমন করে ?"

আমি ততক্ষণে বাইরে এসে মেঝে থেকে মোমবাতিটা তুলে নিয়েছি। উনি একটা শুকনো গাউন যোগাড় করে নেওয়ার পরে আমায় ডাক দিতেই সেই আলো হাতে নিয়ে ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। মিস্টার রস্টার মোমবাতি নিজের হাতে নিয়ে খাট বিছানা ভাল করে দেখতে লাগলেন। সব কালোয় কালো—আধপোড়া কাঠ, আধপোড়া শয্যাদ্রব্য।

দেখে শুনে তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"হয়েছিল কী ?

বললাম—"একটা হাসি শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। এসে দেখি—"

উনি বাধা দিয়ে বলে উঠলেন—"হাসি ? কী হাসি ?"

"জোর গলায় অট্টহাসি একটা। আগেও বহুবার শুনেছি—গভীর রাত্রে। কখনও ছাদের উপরে, কখনও বা এই বারান্দায়।"

"হুঃ !"

"মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স বলেছিলেন—গ্রেস্ পুল বেশ একটু পাগলাটে ধরনের মানুষ, সে-ই ও-রকম হাসি হাসে মাঝে মাঝে।"

"হুঁঃ, গ্রেস্ পুল ! তা বটে। সে ও-রকম হাসতে পারে অবশ্য।"

"গ্রেস্ পুলকে দেখব আশা করেই দরজা খুলেছিলাম আমি, তাকে কিন্তু দেখতে পেলাম না—"

তাড়াতাড়ি উনি বললেন—"তবে কাকে দেখলে ?"

"কাউকেই দেখলাম না। দেখলাম শুধু একটা মোমবাতি জ্বলছে বারান্দায়, আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে আপনার ঘরের আধখোলা দরজা দিয়ে।"

"অমনি তুমি আমার ঘরে ঢুকে পড়লে? খুব সাহস তো!"

"সাহস করেছিলাম বলেই" – আর কথা যোগাল না মুখে।

"আমায় বাঁচাতে পেরেছ"—ধীরে ধীরে আশ্চর্য কোমল সুরে বলতে লাগলেন মিস্টার রস্টার—"আমি জানতাম একদিন তুমি আমার মহৎ উপকার করবে। সেইদিনই জেনেছিলাম ওকথা, যেদিন হেলেন ধরে আসতে আসতে নদীর ধারে পড়ে গিয়ে পা ভাঙলাম, আর নিতান্ত অপরিচিত এই দুশমন চেহারার লোকটার সাহায্যের জন্য তুমি এগিয়ে এলে নির্জন বনভূমিতে। কে যেন সেইদিনই আমার কানে কানে বলে দিয়েছিল—'ওরে, চিনে রাখ্ এই মেয়েটিকে, এ তোর জীবনের শুভদেবতা'।

হঠাৎ থেমে গিয়ে ভাবাবেগকে সংযত করলেন মিস্টার রস্টার। তারপর সেইখানে আমাকে একা অন্ধকারে দাঁড় করিয়ে রেখে মোমবাতিটুকু হাতে তুলে নিয়ে উনি উঠে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে চারতলায়। আমার যেমন ভয় করছিল, তেমনি লাগছিল শীত। এক একবার মনে হচ্ছিল—ছুটে পালিয়ে যাই নিজের ঘরে। কিন্তু সে-ইচ্ছা মনেই চেপে রাখলাম—কী জানি যদি আমাকে দিয়ে আর কোন কাজ থাকে ওঁর। ঘরখানা লণ্ডভণ্ড! চাকর-বাকরদেরও তো উনি ডাকছেন না! কাজেই যে কোন রকম সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমাকেই উনি তলব করবেন।

ফিরে এলেন মিস্টার রস্টার।

"হুঁ, গ্রেস্ পুলই বটে—" এই বলেই ও-প্রসঙ্গকে চাপা দিয়ে দিলেন।

আমি বললাম—"বিছানায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারতে চায়, এমন লোককে—"

"কেন ঘরে রেখেছি? না রাখলে যাবে কোথায়? আর ক্ষতিই বা কী রাখলে? পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করলেই কি কেউ কাউকে পুড়িয়ে মারতে পারে? নিয়তি যেমন আমাকে গ্রেস্ পুল পাঠিয়ে

দিয়েছে একটি, তেমনি দিয়েছে একটি জেন আয়ারও। না, আমার উপর ভগবান সদয়।"

সে-রাত্রে অতি কষ্টে ওঁর কাছে বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে ফিরতে পেরেছিলাম।

পরের দিন সকালে বাড়িতে হুলুস্থুল। চাকরদাসীরা, মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স একসঙ্গে সকলের কলরব। আমি অবাক্ হয়ে দেখলাম গ্রেস্ পুলও এসে দাঁড়িয়েছে সকলের সাথে মিস্টার রস্টারের শয়নকক্ষে। আমি যেন কিছুই জানি না, এইরকম ভাব দেখিয়ে গ্রেস্ পুলকেই জিজ্ঞাসা করলাম—"মনিবের ঘরে হয়েছে কী?"

"সে কী! জানেন না আপনি? মনিব আলো জ্বেলে পড়ছিলেন রাত্রে। জ্বেলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মোমবাতিটা উলটে পড়ে বিছানায় লেগে যায় আগুন। ভাগ্যিস, অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগেই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তা নইলে কী যে হত!"

"জেগে উঠে উনি বুঝি নিজেই আগুন নেভালেন?"

"তা নয় তো কী! ছোটখাট কারণে চাকরদের ঘুম ভাঙ্গানোর পাত্র মিস্টার রস্টার নন। নিজেই আগুন নিভিয়ে লাইব্রেরি ঘরে সোফায় শুয়ে বাকী রাতটা কাটিয়ে দিলেন। আচ্ছা—আপনি তো পাশের ঘরেই থাকেন, আপনি কিছুই টের পান নি?"

"একবার একটা হাসি শুনেছিলাম যেন!"

"হাসি? হাসবে কে? না, ও আপনার মনের ভুল।"

"ভুল হওয়াই সম্ভব।" গ্রেস্ পুলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমি বললাম—"তবে এখন থেকে ঘরের দরজায় খিল বন্ধ না করে আমি ঘুমোব না।"

* * *

ঐ ঘটনার দু একদিন পরে মিস্টার রস্টার ঘোড়া আর কুকুর নিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। যাওয়ার সময় কাউকেই কিছু বলেও গেলেন না। মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স বললেন—"ওঁর ঐরকমই দস্তুর। আবার যেদিন ফিরবেন, কাউকেই আগে থাকতে কোন খবর দিয়ে ফিরবেন না।"

এ কথাটি কিন্তু ভুল প্রতিপন্ন হল। দিন পনেরো বাদে একটা চিঠি এল মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সের নামে; আর সেই চিঠি পেয়ে বৃদ্ধা

মহিলা একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। সারা বাড়িতে একতলা, দোতলা, তেতলায় যত শয়নকক্ষ আছে, সব ঝাড়পোঁছ করে বিছানাপত্র রোদ্দুরে দেওয়া হতে লাগল। কী ব্যাপার?

জানা গেল—দিন তিনেকের ভিতরই মিস্টার রস্টার আসছেন। কোন বার তিনি আসবার আগে খবর দিয়ে আসেন না, তিনি যে এবার দয়া করে খবর পাঠিয়েছেন, তার কারণ আছে বিশেষ। সারা জেলার সমস্ত বড়লোককে উনি নেমন্তন্ন করে সঙ্গে নিয়ে আসছেন। ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা। তাঁরা বেশ কিছুদিন থাকবেন থর্নফিল্ডে, তাঁদের আদর-আপ্যায়নের যথোচিত আয়োজন করবার জন্য নির্দেশ এসেছে মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সের কাছে।

যে-সব ঘরে পঞ্চাশ বছরের ভিতর কোন দিন কেউ শয়ন করে নি, সেখানেও শয্যা বিছানো হল। আসবাবপত্রের অভাই নেই, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার অপেক্ষা শুধু। সবাই নানা কাজে ব্যস্ত, আমিও সাহায্য করছি বইকি! আদেলির পড়াশুনা কমে গিয়েছে। অসহ্য উত্তেজনার মধ্যে সে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে অহরহ। কত লোক আসবে, আলাপ পরিচয়ের লোভে অতটুকু মেয়ে রীতিমত লালায়িত। ফরাসী রক্ত যে ওর দেহে!

অবশেষে মিস্টার রস্টার এলেন। ঘোড়ায় চড়েই ফিরলেন। তাঁর পাশে পাশে আর এক ঘোড়ায় এক সুন্দরী মহিলা। মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স দূর থেকে তাঁকে দেখেই সোৎসাহে বলে উঠলেন—"ঐ যে মিস্ ইনগ্রাম। দেখা যাক, এবার যদি থর্নফিল্ডের ভাগ্যে গৃহিণী জোটে!"

এইটুকু বলেই উনি কিন্তু জিভের উপর লাগাম টেনে দিলেন। থর্নফিল্ডের এতদিন গৃহিণী জোটে নি কেন, আমার এ প্রশ্নের কোন জবাবই আমি পেলাম না।

অভ্যাগতেরা এসে গিয়েছেন। প্রায় ত্রিশটি। সমান সংখ্যায় নারী ও পুরুষ। সমান সংখ্যায় নবীন এবং প্রবীণ। এ-অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ অভিজাত বংশগুলিরই লোক এঁরা। সুসভ্য, মার্জিত, শৌখিন, রূপসী মহিলা ও রূপবান পুরুষ। আমি প্রথম দু দিন আদেলিকে নিয়ে উপরতলাতেই বসে রইলাম সংকোচে। কিন্তু মিস্টার রস্টার ডেকে নামালেন আমাদের। আদেলি আসরে ভিড়ে গেল, ফুটফুটে

মেয়েটিকে অনেকেই আদর করে গ্রহণ করল। কিন্তু আমার কথা স্বতন্ত্র। আমাকে ওরা আমল দিতেই চায় না। একে বেতনভুক্ গৃহশিক্ষিকা, তার উপরে আবার একটা রূপহীনা নগণ্য চেহারার নারী। সমুখে বসে থাকলেও ওরা যেন আমাকে চোখে দেখতে পায় না।

মিস্ ইনগ্রাম! কী লম্বাচওড়া চেহারা! তেমনি রূপৈশ্বর্য ভদ্রমহিলার। একটা রাজকীয় মহিমা যেন তাঁকে ঘিরে আছে। মিস্টার রস্টারকে তিনি সারাক্ষণ গ্রাস করে বসে আছেন। সবাই মনে মনে স্থির করে বসে আছে—অচিরেই এ-দুজনের বিবাহ সম্বন্ধ পাকা হয়ে যাবে।

একথা মনে মনে স্থির জেনেছি আমিও। জেনে উদাসীন থাকতে পেরেছি—একথা বলতে পারি কই? নিজের হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মরে যাই। মিস্টার রস্টার অন্য নারীকে বিবাহ করলে আমার তাতে দুঃখের কারণ নেই, এ কথা নিজের বুকে হাত দিয়ে বলা আজ আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মিস্টার রস্টারের সঙ্গে দেখা মাঝে মাঝে হয় বইকি! কিন্তু কথা হয় কদাচিৎ। তাঁর সময়ই নেই।

কিন্তু কদাচিৎ কখনো কথা যখন হয়, তখন অমৃতসিঞ্চনে আমার দেহমন যেন স্নিগ্ধ হয়ে যায়। তাঁর সে কথা এত মিষ্টি! আমাকে যে তিনি একান্ত আপন মনে করেন, তা সে-কথার সুরে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। হৃদয় আমার আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে, কিন্তু তক্ষুনি আমি হৃদয়কে শাসিয়ে উঠি—"ভুলো না, মিস্ ইনগ্রাম ঐ পাশের ঘরেই আছেন।"

ছয়

একদিন প্রাতরাশের সময় মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সের কাছে শুনলাম—মিস্টার রস্টার ভোরে উঠেই কোথায় চলে গিয়েছেন, আজ সারাদিন, এমন কি রাত্রেও তাঁর ফিরবার সম্ভাবনা নেই। বাড়িতে গণ্যমান্য অতিথিরা রয়েছেন, এ-অবস্থায় গৃহস্বামীর এ-রকম অনুপস্থিতি একটু

বিসদৃশ লাগে না? অন্যদের ভিতর বিস্ময়ের গুঞ্জরন শোনা গেল। মিস্ ইনগ্রাম মুখে কিছু না বললেও ভিতরে ভিতরে যে বিরক্ত হয়েছেন, তা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম।

বিকালের দিকে বেশ বৃষ্টি পড়ছিল। সেই বৃষ্টির ভিতর একখানা গাড়ি এসে ঢুকল বাড়ির হাতায়। সবাই ছুটে গেল জানালার কাছে—ঐ বুঝি মিস্টার রস্টার এলেন! কিন্তু না, তা তো নয়! গাড়ি থেকে নামলেন এক অপরিচিত ভদ্রলোক। বয়স মিস্টার রস্টারের মতনই হবে এঁরও।

ভদ্রলোক ভিতরে এলেন। গাড়ি চলে গেল।

মিস্টার রস্টার বাড়িতে নেই শুনে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন—"তাতে কিছু অসুবিধা হবে না আমার। আমি তাঁর এতদিনের পুরাতন বন্ধু যে তাঁর অনুপস্থিতিতেও তাঁর বাড়িতে অনায়াসেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারব।"

ভদ্রলোক পাকাপোক্ত হয়ে বসে গেলেন, খানাপিনায় খোশ-মেজাজে অংশগ্রহণ করলেন। তাঁর নাম শোনা গেল মিস্টার মেসন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—তিনি জ্যামেকায় থাকেন, অল্পদিন আগে সে দেশ থেকে ইংলণ্ডে এসেছেন।

সন্ধ্যা হয়ে এল। সর্দার খানসামা এসে বিশিষ্ট অতিথিদের সমুখে সসংকোচে নিবেদন করল—রান্নামহলে এক বেদেনী এসেছে। সে সমাগত ভদ্রমহিলাদের ভাগ্যগণনা করতে চায়।

মহিলারা খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। মিস্টার রস্টার বাড়িতে না থাকায় সবাইয়েরই বড় একঘেয়ে লাগছিল, এই একটু যেন উত্তেজনার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। ভদ্রলোকেরা, অর্থাৎ তরুণেরা বিমর্ষ হলেন একটু, কারণ বেদেনী শুধু মহিলাদেরই ভাগ্য গুনবে, পুরুষেরা তার অস্পৃশ্য।

বেদেনীকে এনে বসানো হল ড্রইংরুমের পাশের ছোট একটি কামরাতে। মাঝের দরজা দিয়ে এক একজন করে মহিলাদের যেতে হবে। নিজের ছাড়া অন্য কারও সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তা করতে সে নারাজ। তার একগুঁয়েমি এবং বায়নাক্কা দেখে ভদ্রলোকেরা তো রেগে গেলেন রীতিমত—"ঘাড় ধরে বিদায় করে দাও ডাইনীটাকে"—মন্তব্য শোনা গেল।

কিন্তু মহিলারা ভাগ্য গোনাতে উৎসুক। ডাইনীর সব আবদার মেনে নিয়ে তারই মত অনুসারে সব ব্যবস্থা হতে লাগল। এক একজন করে মহিলারা দরজার ওপারে যেতে থাকলেন।

মিস্ ইনগ্রাম ফিরে এলেন। আশা করা গিয়েছিল তাঁর মুখ হাস্যোজ্জ্বল দেখাবে। এই বেদেনীরা চিরদিনই একটা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে কাজ করে। যে বাড়িতে যাবে, আগে থাকতে সে বাড়ির অধিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু কিছু গোপন খবর সংগ্রহ করে নেবে। তারই উপর ভিত্তি করে মুখরোচক জল্পনা কিছু শুনিয়ে দেবে মক্কেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। সুতরাং আমরা ধরেই নিয়েছিলাম মিস্ ইনগ্রামের যে মিস্টার রস্টারের সঙ্গে বিবাহ হওয়া একান্ত অবধারিত, তা এ বুড়ী জেনেই এসেছে। এবং সেই সম্বন্ধেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কিছু চিত্র সে মিস্ ইনগ্রামের সমুখে মেলে ধরবে। কিন্তু কই? তাই যদি হবে, তা হলে মিস্ ইনগ্রামের মুখ অমন আঁধার কেন? যে সখীরা চটুল পরিহাস দিয়ে তাঁকে সম্ভাষণ করবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন, তাঁরা আর কথা কইতে সাহস পেলেন না মিস্ ইনগ্রামের আঁধার মুখ দেখে।

সেই সখীদেরও ডাক পড়ল একে একে। তাঁরা সব বেরিয়ে এলেন প্রসন্ন মুখেই। কেউ হেসে গড়িয়ে পড়ছেন, কারও বা মুখে মুচকি হাসি। ভবিষ্যদ্বাণী যে তাঁদের অনুকূলে গিয়েছে, তাতে আর কারও সন্দেহ করবার উপায় নেই।

বেদেনী গুনতে চেয়েছিল মহিলাদের ভাগ্য। আমিও যে মহিলা-পদবাচ্য হতে পারি, একথা অতিথিদের কারও মাথায় আসে নি। কাজেই সর্দার-খানসামার উপর হুকুম হল এবার 'ওকে বকশিশ দিয়ে বিদায় কর।' যিনি যা খুশী, তুলে দিলেন খানসামার হাতে। সে নিয়ে চলে গেল পাশের ঘরে। ফিরে এসে বলল—"বকশিশ দিয়েছি, কিন্তু সে যেতে চাইছে না।"

"যেতে চাইছে না? মানে?"—সকলের মুখে সবিস্ময় প্রশ্ন।

"না, সে বলছে—এখানে আরও একজন মহিলা আছেন, তাঁর ভাগ্য গণনা না করে সে যাবে না।"

আর একজন মহিলা? ওঁরা হিসাব করে দেখলেন—ওঁদের কারও হাত গোনা বাকী নেই। "বলছ কী? কেউ বাকী নেই"—সবাই ধমকে উঠল খানসামার উপরে।

খানসামা সবিনয়ে বলল—"বাকী আছেন একজন। তাঁর নাম বলেই দিয়েছে বেদেনী। তিনি ঐ বসে আছেন—মিস্ জেন আয়ার।"

সবাই চমকে উঠল তো বটেই, বিস্মিত বিরক্ত ভাবে তাকাতে লাগল আমার দিকে। বর্ষীয়সী মিসেস্ ডেন আমাকে বললেন—"যাও বাপু, শুনে এস কী বলে। বুড়ীটা বিদায় হলে যে বাঁচা যায়।"

বুড়ীটা এঁদের কী অপকার করেছে, ভেবে পেলাম না। যা হোক কথা বাড়াতে আমার ইচ্ছা ছিল না। ভাগ্য গোনাবার তিলমাত্র আগ্রহ না থাকলেও আমি পাশের ঘরে ঢুকলাম গিয়ে।

একখানা আরাম কেদারায় আরাম করেই বসেছে বেদেনী। আগুনের ধারেই বসেছে। অথচ সারাগায়ে, এমনকি মাথায়ও কাপড় জড়ানো। মাথা এভাবে ঢাকা যে মুখখানাও দেখা যায় না। বাপ্, আগুনের পাশে বসেও এত শীত!

"এস, তোমার নাম কী?"

"তুমি গুনতে এসেছ, তুমিই বল।"—বললাম আমি।

"বলি তা হলে, তোমার নাম জেন আয়ার। তোমার তিন কুলে কেউ নেই। তোমার মনটা আজকাল খুব খারাপ যাচ্ছে। তুমি একজনকে ভালবাসতে চাইছ, সাহস পাচ্ছ না—সে আবার অন্য নারীকে ভালবেসেছে মনে করে।"

কণ্ঠস্বরে চিনে ফেললাম—মিস্টার রস্টার।

হাসি চাপতে পারলাম না—"এ আবার কী খেলা? বাড়িতে সবাই ভাবছে। মিস্ ইনগ্রামের মুখ হাঁড়ি-পানা"—ওঁর রসিকতা দেখে আমিও একটু রসিকতা করবার সাহস পেলাম।

"মিস্ ইনগ্রামের মুখ এখন ঐরকমই দেখবে বরাবর। কিন্তু তোমার হাত বাড়িয়ে দাও। আমি সত্যিই গুনতে জানি—"

আমি হাত পিছন দিকে চালান করে দিলাম। বললাম—"ছেলেখেলা রাখুন। এক ভদ্রলোক বিকালবেলা থেকে এসে বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন না?"

"ভদ্রলোক? কোথাকার ভদ্রলোক?"

"নাম মেসন। জ্যামেকার।"

"হঠাৎ যেন একটা প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে কোথায় এইভাবে চমকে

উঠেছেন মিস্টার রস্টার, মুখখানা ফেকাশে হয়ে গিয়েছে। "মেসন? মেসন? জ্যামেকার?"—একটু চুপ করে থেকে বললেন—"জেন! ওঘর থেকে এক গেলাস কিছু পানীয় আমায় এনে দিতে পার? বড় ঘা খেয়েছি একটা।"

আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম। কোন সংকোচের ভাব না দেখিয়ে, মাননীয় অতিথিদের দঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়ে এগিয়ে গেলাম খাওয়ার টেবিলের দিকে, সেখান থেকে খানিকটা জল মেশানো ব্রাণ্ডি নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম মিস্টার রস্টারের কাছে। আমার বেপরোয়া হাল-চাল দেখে অতিথি মহলে তখন সশব্দ বিরূপ মন্তব্য শুরু হয়ে গিয়েছে।

ব্রাণ্ডি পান করে মিস্টার রস্টারের মুখে রক্ত ফিরে এল। তিনি হেসে বললেন—"তুমি তা হলে হাত গোনাবে না? তা না গোনাও, আমি আর এক সময় তোমায় বলব। এখন ঐ মেসনটার সঙ্গে দেখা না করলে নয়। আমি পিছন দিয়ে নিজের ঘরে উঠে যাচ্ছি, সেখান থেকে পোশাক বদলে আসি। তুমি ওঘরে বলতে পার ডাইনীবুড়ী চলে গিয়েছে।"

* * *

দশ মিনিটের ভিতরই ভদ্রবেশে নেমে এলেন মিস্টার রস্টার। আশ্চর্য! মিস্ ইনগ্রাম তো উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন না। নিতান্ত মামুলী একটা নমস্কারের বিনিময় করেই ক্ষান্ত হয়ে রইলেন তিনি। মিস্টার রস্টার তাঁকে এবং অন্য সবাইকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে সোজা চলে গেলেন মেসন নামক নবাগত অতিথির দিকে, এবং তাঁর হাত ধরে নিরিবিলি একটা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেখানে তাঁদের কী কথাবার্তা হতে লাগল, তা এধার থেকে শোনবার কোন উপায় ছিল না।

তা না থাকুক, সে কথাবার্তায় অপ্রীতিকর কিছু ছিল বলে তো অনুমান করতে পারলাম না! কয়েক মিনিট বাদে দুজনে যখন এসে অন্য অতিথিদের সঙ্গে মিলিত হলেন, তখন বেশ হাসিখুশী দেখা গেল দু'জনাকেই। আমার মনের খটকা কিন্তু তখনও গেল না। মিস্টার রস্টার মনের ভাব গোপন করছেন না তো? বেদেনী-পর্বের অভিনয়ের সময়ে মেসনের নাম শুনেই তিনি যে রকম বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন,

তাতে আমি তো কোনমতেই মনে করতে পারি না যে উক্ত ভদ্রলোকের উপস্থিতি তিনি ঠিক প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন।

যা হোক, সন্ধ্যাবেলাটা ভালই কেটে গেল। নৈশভোজ সমাধা হল হাসি গান হই-হুল্লোড়ের ভিতর। আদেলিকে নিয়ে আমি উপরে উঠে গেলাম নয়টা বাজতেই। ও ঘুমিয়ে পড়ল, আমিও গিয়ে শয্যাগ্রহণ করলাম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, কতক্ষণ ঘুমিয়েছি—কে জানে। হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনে ঘুম ভেঙে গেল আমার। হঠাৎ বুঝতে পারলাম না—সত্যি সত্যি আর্তনাদই শুনেছি, না, দুঃস্বপ্ন দেখেছি একটা। নিশুতি রাত, নিঃশব্দ নিস্তব্ধ চারিধার। সত্যিই কেউ আর্তনাদ করে উঠলে এতক্ষণ কি বাড়িতে শোরগোল পড়ে যেত না? ঘরে ঘরে অতিথিরা চেঁচামেচি শুরু করে দিত না?

কিন্তু, সন্দেহ কাটতে দেরি হল না। সত্যিই কেউ বিপন্ন হয়ে সাহায্যের জন্য আকুল হয়ে ডাকছে মিস্টার রস্টারকে। এবারে আর ভুল হওয়ার উপায় নেই। জেগে জেগেই শুনতে পাচ্ছি! থেমে থেমে ককিয়ে ককিয়ে কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠছে—"রস্টার! এলে না? আমি যে মরে গেলাম রস্টার! আমি যে মারা পড়লাম!" কোথা থেকে শব্দটা আসছে? তেতলা থেকে? না, চারতলা?

ধুপধাপ পায়ের শব্দ। একজন কেউ দৌড়ে উপরে উঠছে সিঁড়ি বেয়ে। কে হতে পারে? আমার মন বলে দিল—ইনি রস্টার ছাড়া কেউ নয়। কেমন করে কী হয় বলতে পারি না, কিন্তু পায়ের শব্দ শুনে আমি মিস্টার রস্টারকে চিনতে পারি।

আমি শুয়ে থাকতে পারলাম না আর। বাড়িতে একটা কিছু বিপদ ঘটেছে, মিস্টার রস্টার দৌড়ে গিয়েছেন উপরে যেখানে সেই আধ-পাগল গ্রেস বুড়ী থাকে। সেদিন বাড়ির মালিককে আগুনে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা হয়েছিল, আজ না-জানি কার গলায় ছুরি মেরেছে। কে? গ্রেস পুল? সে ছাড়া কে আর?

আমার কিছু করবার নেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। মিস্টার রস্টার জেগেছেন, যা করবার তিনিই করবেন। তবে আমার সাহায্য তাঁর দরকার হতে পারে। যদি হয়, তার জন্য তৈরী হয়ে থাকাই আমার কাজ। আমি আলো না জ্বেলে, অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে পোশাক

পরে ফেললাম। তারপর বাগানের দিকের জানালা একটুখানি খুলে দিয়ে তারই পাশে চেয়ারে বসে বাইরের অন্ধকার দেখতে লাগলাম দু'চক্ষু মেলে। পরম রহস্য জড়িয়ে রয়েছে ঐ অন্ধকারের পরতে পরতে, সেই রহস্যেরই এক কণিকা বুঝি ছিটকে এসে বাড়ির চারতলার ঘরে কি-এক বিপ্লব বাধিয়ে বসেছে।

প্রত্যাশা না করেও একটা আহ্বানের জন্য প্রতীক্ষা করছি। এল সে আহ্বান। দরজায় মৃদু অঙ্গুলির টোকা। আমার সন্দেহ রইল না যে ইনি রস্টার। ভিতর থেকেই বললাম—"আমি জেগে আছি বলুন।"

"পোশাক পরেছ?"

"হ্যাঁ"—

"তাহলে এস, খুবই মুশকিলে পড়েছি একটা।"

বেরিয়ে এলাম। বিনা বাক্যব্যয়ে মিস্টার রস্টার উপরে উঠতে লাগলেন, আমি পিছু নিলাম। তেতলা পেরিয়ে চারতলায় এলাম। একটা ঘরের দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। ঘরে মোমবাতি জ্বলছে দুটো। রস্টারের পিছু পিছু ঘরে এসে ঢুকলাম। গ্রেস পুল-কে দেখতে পাব, আশা করেছিলাম, দেখতে পেলাম না। তার বদলে দেখতে পেলাম একজন পুরুষকে। মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না, তবু মনে হল সেই মেসন ভদ্রলোক, জ্যামেকা থেকে যিনি এসেছেন আজই বিকালে।

ভদ্রলোক অচৈতন্য। গলায় একটা ছোরার আঘাত বলে মনে হল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, তার ভিতর থেকে ক্ষীণ ধারায় রক্ত চুইয়ে পড়ছে।

"ব্যাণ্ডেজটা আমি বেঁধেছি। রক্ত ফোয়ারার মত ছুটছিল, এখনও একটু একটু ঝরছে দেখ। একেবারে বন্ধ করতে পারি নি। এক্ষুণি আমি ডাক্তার আনতে যাচ্ছি। কিন্তু রোগীকে একা ফেলে যেতে পারি না। কী জানি—হঠাৎ যদি মারা যায়। তুমি বসতে পারবে তো ওর কাছে? আর কাউকে জানতে দিতে চাই না এ-ব্যাপার।"

তা তো চান না, কিন্তু নিশুতি রাতে, চারতলার এই নির্জন ঘরে, মুমূর্ষু এই লোকটাকে আগলে বসে থাকা কি একাকিনী নারীর পক্ষে সোজা? আমার যে ভয় করতে পারে বিপদ ঘটতে পারে, তা কি একবারও ওঁর ভাবতে নেই? নিশ্চয়! বিপদ তো নিশ্চয়ই ঘটতে

পারে। সেই নরহন্ত্রী গ্রেস তো নিকটেই আছে! হয়তো ঐ পাশের ঘরেই আছে! মালিক চলে গেলেই যে সে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে না—

মনে মনে এই সব ভাবছি, মুখে ওদিকে জবাব দিচ্ছি মিস্টার রস্টারকে—"তা কেন পারব না বসতে? আপনি ডাক্তার নিয়ে আসুন গিয়ে!"

"বাঁচালে"—রস্টার একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন—"মাঝে মাঝে ব্যাণ্ডেজটা ভিজিয়ে দিও এই আরকটা দিয়ে। আর নাকের কাছে ধরো এই স্মেলিং সল্ট। আর, জ্ঞান যদি হয় ওর, নড়তে দিও না।"

কী করে ওর নড়া আমি বন্ধ করব—সে বিষয়ে আর কোন উপদেশ না দিয়ে উনি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।

একটা ছোট ঘড়ি কোথায় যেন টিকটিক করছে। কয়টা বেজেছে দেখতে পাচ্ছি না। টিকটিক শব্দটায় যে এত বিভীষিকা সৃষ্টি হতে পারে, তা কোনদিনই জানতাম না। মিটিমিটি আলো—দেয়ালে দেয়ালে কিসের যেন ছায়া। পর্দার? না, মৃত্যুদূতের? মেসন বেঁচে আছে? না, মরে গেল? ভয়ে ভয়ে ওর নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখি। আঃ, আছে, বেঁচে আছে। বেঁচে থেকে ও যেন মস্ত উপকার করেছে আমার। তাড়াতাড়ি স্মেলিং সল্ট-এর শিশি ওর নাকের কাছে ধরি। কলের পুতুলের মত আরক ঢেলে দিই ব্যাণ্ডেজের কাপড়ে। উঃ—কতক্ষণ? রস্টার কতক্ষণে ফিরবেন, কে জানে? রক্ত ঝরছেই! ততক্ষণ এ-লোক টিকবে?

পাশের ঘরে খিলখিল হাসি। পেত্নীর হাসি বুঝি এই রকমই হয়! একটা ক্রূর, হিংস্র, দানবীয় নিষ্ঠুরতা মাখানো আছে ঐ হাসির লহরে লহরে। এই বুঝি হাস্যময়ী গ্রেস ছোরা হাতে দোর ঠেলে ঢুকে পড়ে এই ঘরে। সত্যিই যদি সে আসে, আমি কী করব? পালাতে তো পারব না, মেসনকে ছেড়ে! ওর ভার যে আমার উপরে দিয়ে গিয়েছেন মিস্টার রস্টার!

সে-রাত্রির সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার বিভীষিকা জীবনে ভুলব না।

মিস্টার রস্টার অবশেষে এলেন—সঙ্গে ডাক্তার।

"দেখ কার্টার। কী করতে পার!"

ঘরের মধ্যে একটা মানুষ এক হাতে মোমবাতি......আমাকে দেখছে

কার্টার রোগী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, রস্টার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"তোমায় না পেলে আমি কী করতাম, জেন ?"

কার্টার ব্যাণ্ডেজটা নতুন করে বাঁধলেন, অনেক ওষুধ-বিষুধ খাইয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন মেসনের। এক ঢোঁক ব্রাণ্ডি খেয়ে নিয়ে মেসন ধীরে ধীরে বলল—"কী সাংঘাতিক মেজাজ হয়েছে ওর! আমাকে দেখা মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ল—"

রস্টার তিরস্কারের সুরে বললেন—"আমাকে সঙ্গে না নিয়ে একা একা তোমার ওর কাছে আসাটাই বোকামি হয়েছে। রাতটা অপেক্ষা করতে পারলে না ? যা হোক তোমায় এক্ষুনি রওনা করে দিচ্ছি, পারবে তো যেতে ?"

"গাড়িতে যদি যাই, পারব—" ক্ষীণস্বরে জবাব দেয় মেসন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, গাড়ি বইকি! কার্টারের গাড়িতেই তুমি যাবে। কার্টারের বাড়িতে দুটো দিন থেকে একটু বল পেয়ে, তারপর লণ্ডন রওনা হওয়া। কী বল, ডাক্তার ?"

"কোন অসুবিধা হবে না"—সংক্ষেপে ভরসা দেন কার্টার।

কার্টার এবং রস্টার দুইজনে ধরাধরি করে মেসনকে যখন গাড়িতে তুলে দিলেন, তখন ভোরের আলো ধীরে ধীরে ফুটছে। আমি নিজের ঘরে নেমে এসে জানালা দিয়ে দেখছি সব। দুই একজন অতিথি প্রাতর্ভ্রমণের জন্য বাগানে নেমে এলেন। রস্টার হাসিমুখে তাঁদের সুপ্রভাত জানিয়ে বললেন, "আর দুই মিনিট আগে এলে মেসনের সঙ্গে দেখা হত। সে ঐ গাড়িতে চলে গেল লণ্ডনে।"

সাত

কয়েক দিন যায়। মিস্টার রস্টারের সঙ্গে কদাচিৎ দেখা হয় আমার, নিরিবিলি দেখাসাক্ষাৎ তো নয়ই। মেসনের সম্বন্ধে ভিতরের কথা কিছু জানতে পারি নি, গ্রেস পুল তো দেখছি আগের মতই বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে থর্নফিল্ডে। আশ্চর্য হই এই খুনে স্ত্রীলোকটির আধিপত্য দেখে এ বাড়িতে। আমার চোখের উপরেই, অল্পদিনের ব্যবধানে, দু দুটো নরহত্যার চেষ্টা সে করেছে, অথচ, তাকে সাজা

দেওয়া তো দূরে থাকুক, একটা কড়া কথাও কেউ বলতে নারাজ। রহস্যের ব্যাপার, সন্দেহ কী!

এক একবার মনে হয়—পাছে এই রহস্যের সমাধান আমি দাবি করে বসি, এই ভয়েই রস্টার আমায় এড়িয়ে চলেছেন। পাগল। আমি কে? ত্রিশ পাউণ্ড মাইনের গৃহশিক্ষিকা মাত্র। আমার অত স্পর্ধা হতে যাবে কেন? কৌতূহল বোধ করতে পারি, ভয় পেতে পারি, কিন্তু তা বলে অনধিকারচর্চা করব কেন?

অনধিকারচর্চা ছাড়া কী? আমি মনে করি না যে সেদিন রাত্রে মিস্টার রস্টারের একটু কাজে লাগতে পেরেছিলাম বলে তাঁর গোপন কথা জানবার কোন অধিকার আমার জন্মেছে। সে অধিকার যদি কারও থাকে, তবে সে হল ঐ মিস্ ইনগ্রাম—অভিজাত বংশের গরবিনী রূপসী।

কিন্তু এও এক রহস্য। মিস্টার রস্টারকে প্রায়ই আর মিস্ ইনগ্রামের কাছে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। আর মিস্ ইনগ্রামের মুখেও আগের সে বিজয়িনীর হাসি আর দেখতে পাই না, তার বদলে মুখে চোখে কেমন যেন একটা সন্দিগ্ধ সংকুচিত ভাব ভদ্রমহিলার। এর মানে কী?

কিন্তু—থর্নফিল্ডের চলমান জীবননাট্যের অভিনয় দেখবার সুযোগ আমার হল না আর। অতীতের হাতছানি আমায় ডাকল।

একদিন বিকালবেলায় বাগানে খেলা করছি আদেলির সঙ্গে, খবর এল কে একজন ডাকছে আমায় রান্নাবাড়িতে। আদেলিকে একা একা খেলতে বলে চলে গেলাম তক্ষুণি, গিয়ে রীতিমত অবাক। নয় বৎসর বাদে দেখা, কিন্তু চিনতে একটুও কষ্ট হল না—এ সেই বেসী। গেটস্‌হেড-এর বাড়িতে যে বেসী আমার দেখাশোনা করত।

একেবারে জড়িয়ে ধরলাম বেসীকে। রীডদের বাড়িতে যদি কখনও কারও কাছে এতটুকু মিষ্টি ব্যবহার পেয়ে থাকি, তবে সে এই বেসীর কাছে। লোউড যাত্রার দিন দশবছরের ছোট্ট জেনকে শেষ রাত্রের ঠাণ্ডায় কফি খাইয়ে গাড়িতে তুলে দিয়েছিল একমাত্র এই বেসী, তার মামীমা নয়, মামাতো ভাই বা বোনেরা নয়।

বেসী একটু মোটা হয়েছে, ভারিক্কি হয়েছে। হালচাল আগের মতনই আছে দেখলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল আমাকে।

তার পরে বলল—"তুমি ত পুরোদস্তুর ভদ্রমহিলা এখন। আমি দাসী বাঁদী মানুষ, কী ভাবে তোমার সঙ্গে কথা কইব, বুঝতে পারছি না।"

সে কথার উত্তরে আমি তাকে আর একবার জড়িয়ে ধরে আদর করলাম। তখন সে সাহস পেয়ে বলল—"গেট্‌সহেড থেকে আসছি। তোমার মামীমার খুব অসুখ। বাঁচার আশা নেই। দেখতে চাইছেন তোমাকে।"

ওঃ তাই নাকি ? কিন্তু বাঁচার আশা নেই বলেই আমায় দেখতে চাইবেন, এমন স্নেহময়ী মামীমা তো মিসেস্ রীড নন ! এর ভিতর কী যেন ব্যাপার আছে।

হ্যাঁ, ব্যাপার আছে, তা বেসী স্বীকার করল। কী একটা গোপন কথা আমায় না জানিয়ে মিসেস্ রীড মরতে পারছেন না। তার মনে ধারণা জন্মেছে—সে কথা বলবার আগে যদি তিনি মরেন, তা হলে তাঁর আত্মার সদ্‌গতি হবে না।

বেসী বিশেষ অনুনয় করতে লাগল—"যাবে না তুমি ? খুবই খারাপ ব্যবহার তিনি করেছিলেন তোমার সঙ্গে, তা ঠিক। তবু যে লোক মরতে বসেছে—"

"না, না, আমি যাব বইকি !" আমি একটুও ইতস্ততঃ না করে বললাম—"ব্যবহার যা-ই করে থাকুন, মরণকালে যখন তিনি দেখতে চাইছেন আমাকে, আমি নিশ্চয়ই যাব। তুমি রাতটা থাকো এখানে। কাল ভোরেই আমি তোমার সঙ্গে রওনা হব।"

মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সকে আমার অতিথির কথা বলতেই তিনি সমাদর করে বেসীর রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমি ছুটলাম মিস্টার রস্টারের কাছে। ছুটি নিতে হবে। ভাগ্য ভাল, আজ মিস্টার রস্টারকে ড্রইং-রুমেই পেলাম। তাঁকে ঘিরে রয়েছে তাঁর মান্যগণ্য অতিথিরা, আট দশটি ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়। কিন্তু ইতস্ততঃ করার বা দেরি করার সময় আমার নেই। আমি সেই ভিড়ের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বলতে বাধ্য হলাম—"মিস্টার রস্টার, আমি কি এক মিনিট সময় নিতে পারি আপনার ?"

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়েরা এটাকে আমার দস্তুরমত ধৃষ্টতা বলে মনে করলেন—তাতে সন্দেহ নেই ; কিন্তু মিস্টার রস্টার—"নিশ্চয়ই,

মিস্ আয়ার"—বলে সঙ্গে সঙ্গেই ভিড় থেকে বেরিয়ে এলেন। আমরা এসে দাঁড়ালাম একেবারে বাগানের সিঁড়িতে।

"আমার যে কয়েকদিন ছুটি চাই মিস্টার রস্টার! আমার এক আত্মীয়া মরণাপন্না, তিনি লোক পাঠিয়েছেন আমায় নিয়ে যাবার জন্য!"

"আত্মীয়া? তুমি না বলেছিলে তোমার কেউ নেই আপনজন?"

"সম্পর্কে আত্মীয়া, আপনজনের মত ব্যবহার করেন নি।"

"তবু তুমি যেতে চাইছ?"

"মুমূর্ষুর আবেদন—মিস্টার রস্টার—"

"তা বটে! কতদিন লাগবে তোমার?"

"দিন পনেরো হলেই হবে?"

"টাকাপয়সা নেই নিশ্চয়ই?"—এই বলে পকেট থেকে একখানা পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোট বার করে দিলেন মিস্টার রস্টার। আমি সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম—"ছয় মাসে আমার পাওনা হয়েছে পনেরো পাউণ্ড। পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড তো আমি ফেরত দিতে পারব না!"

"ওঃ, ফেরত দিতে পারবে না!"—মিস্টার রস্টারের কথার সুরে যেন একটু ক্ষোভ। অর্থাৎ মাইনে হিসাবে তিনি ওটা দেন নি, ফেরত পাওয়ার কল্পনাও তাঁর মাথায় ছিল না। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি ক্ষুব্ধ হলে আমি কী করতে পারি? যা আমার পাওনা নয়, তা আমি নেব কেমন করে?

মিস্টার রস্টার গুনে গুনে পনেরো পাউণ্ড দিলেন আমাকে, তারপর বললেন—"পনেরো দিনের বেশী করো না কিন্তু।"

আমার মাথায় দুষ্টামি চাপল, বললাম—"রোগী মানুষকে দেখতে যাচ্ছি, তিনি যদি চটপট না মরেন, কী করে চলে আসব, বলুন।"

"অর্থাৎ তুমি পনেরো দিনে আসবে না ফিরে। অত অর্থ তোমায় দেওয়া ঠিক হয়নি দেখছি। দেখ জেন, আমার আজকাল খুব হাত টান যাচ্ছে, এত অতিথি বাড়িতে, দেখছ তো? তুমি বরং পাঁচ পাউণ্ড নিয়ে যাও, বাকী দশ পাউণ্ড আপাততঃ ফেরত দাও আমাকে। মনে কর, আমি ধার নিচ্ছি তোমার কাছে।"

আমি নোটগুলো জামার ভিতরে পুরে বললাম—"ধার যদি নিতেই হয়, মিস্ ইনগ্রামের অনেক টাকা আছে, সেখান থেকে নিন গিয়ে। আমি কতদিনের জন্য যাচ্ছি কে জানে। টাকার দরকার কত!"

"উঃ, কী সাফ জবাব! আচ্ছা দশ পাউণ্ড ফেরত না দাও, অন্ততঃ পাঁচটা পাউণ্ড তো দাও। তাও না? উঃ! একেবারে সাইলক দি জ্যু! যাক্, টাকা না-দাও ক্ষতি নেই, কিন্তু কথা দিয়ে যাও যে নিতান্ত যে-কয়দিন দরকার, তার চেয়ে বেশী একদিনও থাকবে না সেখানে।"

"না, তা থাকব না। আদেলির পড়াশুনার ক্ষতি হবে আমি না থাকলে, তা কী বুঝি না আমি?"

"আদেলি ছাড়া আর কারও কোন ক্ষতি হবে না, তা কী করে জানলে তুমি? মনে কর, রাত্রে আমার বিছানায় আবার যদি আগুন লাগে, কে তা নেভাবে? বা, নিশুতি রাতে মুমূর্ষু রোগীকে আগলাবার জন্য যদি একটা বিশ্বাসী লোকের আমার দরকার হয়, সে লোক আমি কোথায় পাব?"

কী দুর্মতি আমার হল, ভগবান জানেন। বললাম—"মিস্ ইনগ্রামকে ডাকলেই—"

"মিস্ ইনগ্রাম? কে মিস্ ইনগ্রাম?"—মিস্টার রস্টার ফেটে পড়লেন একেবারে—"সেই বেদেনী যেদিন হাত গুনে বলেছিল যে থর্নফিল্ডের জমিদারির আয় বলতে কিছু নেই, তার পর থেকে মিস্ ইনগ্রামের মুখে হাসি দেখেছ তুমি?"

আমি বড় বড় চোখ মেলে তাকালাম—"এই কথা বেদিনী বলেছিল মিস্ ইনগ্রামকে? এমন ডাহা মিথ্যে কথা?"

মিস্টার রস্টার আক্ষেপের সুরে বললেন, "না বলে করে কী? ঐ মিথ্যে কথা না বললে যে মিস্ ইনগ্রামের জাল কেটে বেরুতে পারি না আমি!"

* * *

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় গেট্সহেড পৌঁছে গেলাম।

প্রথমে বেসীর ঘরেই উঠতে হল। অর্থাৎ দরোয়ান লিভেনের ঘরে। বেসী তাকেই বিবাহ করেছে।

বেসী আমাকে চা না খাইয়ে ছাড়লে না। কী পরিচ্ছন্ন পরিবেশ! কী সুখের সংসার! ওদের ছেড়ে মামীমার প্রাসাদে পা বাড়াতে আমার রুচি হচ্ছিল না। খবর যা শুনলাম—তাতে ও তো এখন অভিশপ্ত পুরী!

শুনলাম জন রীড—সেই ধুরন্ধর মামাতো ভাই আমার, যে আমাকে

ছুঁয়া না দিয়ে জলগ্রহণ করত না, সে মারা গিয়েছে সম্প্রতি। পুলিসের বিশ্বাস—সে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা করার মত অবস্থাতেই সে নাকি পৌঁছেছিল। লণ্ডনেই থাকত ইদানিং। অসম্ভব বাবুয়ানার ফলে গেট্‌সহেড জমিদারির সর্বনাশ করে ছেড়েছিল। টাকার জন্য মায়ের সঙ্গে অনবরতই কলহ চলত, শেষকালে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে মাতাপুত্রে আলাপ ছিল না, মিসেস্ রীড সাফ জবাব দিয়েছিলেন যে জন আর এক ফার্দিং-এরও যেন প্রত্যাশা না করে গেট্‌সহেড থেকে। এদিকে জন তার লণ্ডন-বাসের নিয়মিত এবং অনিয়মিত ব্যয় এমনভাবে বাড়িয়ে তুলেছে যে কোনদিক দিয়েই তা সংকোচ করা সম্ভব হল না তার পক্ষে। ফলে—অপঘাত মৃত্যু। পুলিস সংগত কারণেই মনে করেছে যে ঘটনাটা আত্মহত্যাই বটে।

সেই শোকের আঘাতেই মিসেস্ রীড নিজেও মরণাপন্ন হয়েছেন। স্বাস্থ্য তো তাঁর আগে থাকতেই ভেঙেছিল, তার উপর এই নিদারুণ বিপর্যয়। এদিকে মেয়ে দুটিও চরম অবাধ্য। বড় মেয়ে এলিজা সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হওয়ার জন্য তৈরী, ছোটটি আবার সংসার ছেড়ে সামাজিক বিলাসে গা ভাসাবার জন্য লালায়িত। লণ্ডনে তার মামা—অর্থাৎ মিসেস্ রীড-এর ভাই থাকেন, সুবিধা পেলেই জর্জিয়ানা তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠে বসে। চেহারা জর্জিয়ানার তো খুবই ভাল, কাজেই লণ্ডন-সমাজে তাকে নিয়ে হইচইও খানিকটা হয়। আজকাল সে গেট্‌সহেড-এ আছে বটে, কিন্তু মা মরলেই সে যে আবার মামাবাড়িতে চলে যাবে, তাতে কারও সন্দেহ নেই।

সব কথা শুনে আমি মামীমায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চললাম। এলিজা ও জর্জিয়ানা একটা ঘরে বসে ছিল। এলিজা করছে সেলাই, জর্জিয়ানা পড়ছে বই। আলাপ বন্ধ, অর্থাৎ দুই বোনে তেমন সদ্ভাব নেই।

আমায় দেখে তারা আশ্চর্য হল না, কারণ তাদের মা যে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, তা তো ওরা জানে! আশ্চর্য হল না, কিন্তু কোনরকম সম্ভাষণও করল না। একান্ত অপরিচিত কেউ যেন ঘরে ঢুকেছে, এই রকম একটা উদাসীন ভাব তাদের মুখে চোখে।

আমিও উদাসীন হতে শিখেছি আজকাল। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দাসীদের বললাম—“মামীমা অর্থাৎ মিসেস্ রীডের আহ্বানে

আমায় আসতে হয়েছে, হয়তো কিছুদিন এখানে থাকতেও হবে, একটা ঘর আমায় দেখিয়ে দাও।”

বলা বাহুল্য আমায় আনবার জন্য একশো মাইল দূরের থর্নফিল্ডে লোক পাঠানো হয়েছে, একথা দাসীদের অজানা ছিল না। কাজেই তারা আমায় হাঁকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল না। ঘর একখানা দেখিয়ে দিল। বেসীর স্বামী রবার্ট আমার বাক্সটা এনে তুলে দিল সেই ঘরে।

মিসেস্ রীড-এর সঙ্গে রাত্রে দেখা হবে না, শুনলাম। তিনি ঘুমিয়ে আছেন। প্রশ্ন করে করে বুঝলাম—ঘুম অর্থে অচৈতন্য অবস্থা ধরে নিতে হবে। পুরো জ্ঞান নাকি তাঁর কদাচিৎই থাকে। প্রায় সব সময়ই একটা আচ্ছন্ন ভাব। কোনও কথা বলেন না, কোন কথা বললে বোঝেনও না।

সেরাত্রির মত দেখা করার চেষ্টা থেকে বিরত হলাম। পরের দিন দেখা হল বটে, কিন্তু কথা হল না। আমি গিয়ে সমুখে দাঁড়ালাম, তিনি আমাকে চিনলেন বলে মনে করবার কারণ কিছু দেখলাম না। আমি তাঁর হাত ধরে মিষ্টি করে বললাম—“আমায় চিনতে পারছেন না মামীমা? আমি জেন আয়ার!” তিনি ফ্যালফ্যাল করে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর পাশ ফিরে চোখ বুজলেন।

দাসীরা বলল—“চিনবেন। ব্যস্ত হলে হবে না। কদাচিৎ কখনো চৈতন্য ফিরে আসে, সে-সময় কথা বলেন দু-একটা, বুঝতেও পারেন সব কথা। আপনাকে কী একটা জরুরী কথা বলবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছেন। চৈতন্য যখন হবে, নিশ্চয় বলবেন সে-কথা। ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ততক্ষণ বা ততদিন।”

উপায়ান্তর তো নেই, হতাশ হয়ে চুপচাপ বসে রইলাম। নিত্য তিনবেলা খবর নিই, মিসেস্ রীড-এর চৈতন্য হল কিনা। তা ছাড়া আর করব কী।

আশ্চর্য দেখলাম এই—এলিজা বা জর্জিয়ানা মায়ের ঘরে একবারও যায় না। খবর নেয় দাস-দাসীদের মুখ থেকেই। নিজেদের ভবিষ্যতের চিন্তাতেই তারা অস্থির। মা চক্ষু বুজলেই ওরা এ বাড়ির মায়া কাটিয়ে চিরদিনের মত বেরুতে পারে। অবশ্য না বেরিয়েও উপায় নেই, কারণ জন রীড যা দেনা করে গিয়েছে, তার দরুন গেট্‌সহেড বিক্রি হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে।

অবশেষে একদিন মিসেস্ রীডের জ্ঞান ফিরে এল। রোজ যেমন তিন চার বার ওঁর ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ কাটাই, সেদিনও তেমনি গিয়েছি। দেখি উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে তিনি আধ-বসা অবস্থায় দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি গিয়ে সমুখে দাঁড়াতেই তিনি চমকে উঠলেন, গলা দিয়ে একটা অস্বাভাবিক স্বর বেরুলো —"কে ?"

আমি বললাম—"আমি জেন আয়ার। চিনতে পারছেন না ?"

মিসেস্ রীডের মুখখানা কালো হয়ে এল—"জেন আয়ার ! জেন আয়ার ! ছেলেবেলায় জেন আয়ার অতি খারাপ মেয়ে ছিল। একদিন মুখের উপর আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিল। অতি অন্যায় কথা সব বলেছিল। একেবারে মিথ্যে কথা। আমি না কি তাকে যত্ন করি নি, আমি নাকি তাকে কষ্ট দিয়েছি—অতি খারাপ মেয়ে—"

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এখনও আমার উপর বিদ্বেষ পুষে রেখেছেন এই ভদ্রমহিলা। তা রাখুন, আমার তাতে ক্ষতি নেই কিছু। কিন্তু উনি তা হলে লোক পাঠিয়ে একশো মাইল দূর থেকে ডেকে আনলেন কেন আমাকে ?

ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি আমাকে ডেকে পাঠালেন কেন ?"

"আমি ডেকে পাঠিয়েছি ?"—অবাক্ হওয়ার পালা এবার তাঁর।

"নিশ্চয়ই। আমি ছিলাম এখান থেকে একশো মাইল দূরে। এখান থেকে আপনার লোক লোউড স্কুলে গিয়েছিল আমার খোঁজ করবার জন্য। সেখান থেকে ঠিকানা পেয়ে থর্নফিল্ডে গিয়ে ধরেছে আমাকে। মৃত্যুর পূর্বে কী যেন আমাকে বলতে চান আপনি—ভাল করে মনে করে দেখুন !"

সব কথা তাঁর কানে গেল কি না, বুঝলাম না। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন বালিশে হেলান দিয়ে, তারপর আবার তাকালেন আমার দিকে। "টেবিলের ঐ টানা খুলে ফেল দেখি !"

টেবিলের টানা খুলে এক গাদা দলিলপত্র দেখতে পেলাম।

"সব কাগজের নীচে একখানা চিঠি আছে। ঐটি বার কর।"

সত্যিই একখানা খামের চিঠি রয়েছে। উপরে নাম লেখা আছে মিসেস্ রীডের।

"পড়"—

আমি পড়লাম—

"মহাশয়া! আপনি যদি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী জেন আয়ারের ঠিকানাটি আমায় জানান, বড়ই উপকার হয়। জীবনে আমি আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছি, এদিকে আমি অবিবাহিত, নিঃসন্তান। জেনকেই আমি আমার উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করেছি এবং তাকে এখন থেকেই আমার কাছে এনে রাখতে চাই।

জন আয়ার, মাদিরা।"

তারিখ দেখলাম—তিন বৎসর আগেকার।

"তিন বৎসরের পুরানো চিঠি আপনি আজ আমায় দেখাচ্ছেন?" বিরক্তভাবেই প্রশ্ন করলাম।

"কোন দিনই দেখাবার ইচ্ছা ছিল না—" মরণপথের যাত্রী ঐ নারী ক্রুদ্ধ ভাবেই জবাব দিল—"তুমি মোটেই ভাল মেয়ে নও, ধনী কাকার উত্তরাধিকারিণী হয়ে তুমি নবাবী কর, এটা আমার পছন্দ হয় নি। কিন্তু মরণকালে লোকের বিপরীত বুদ্ধি হয়, আমারও হয়েছে! তাই কিসের তাগিদে জানি না—খুঁজে এনে তোমায় খবরটা দিয়ে গেলাম। যাও এখন তুমি, আমি ঘুমোব।"

আমি মামুলী বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে চলে এলাম—ধন্যবাদ বা গঞ্জনা কোনটাই না দিয়ে। তখন কি জানি ওঁর সঙ্গে সেই দেখাই শেষ দেখা? পরের দিন সকালে দাসীদের মুখে খবর পেলাম—রাত্রিতেই মিসেস্ রীড শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, মরণকালে কেউ তাঁর কাছে উপস্থিত ছিল না।

তার পর তাঁর সমাধি হল, এলিজা চলে গেল এক সন্ন্যাসিনীর মঠে, জর্জিয়া চলে গেল লণ্ডনে মামাবাড়িতে। আমি রওনা হয়ে গেলাম থর্নফিল্ডে, গেট্সহেড-এর বাড়িতে তালা পড়ল, বিক্রি করে মহাজনের দেনা শোধ করবেন পারিবারিক উকিল।

এক মাস পরে থর্নফিল্ডে ফিরলাম—মনে উল্লাস, যেন নিজের বাড়ি ফিরছি।

আট

এ যে স্বপ্নাতীত!

মিস্ ইনগ্রামের সঙ্গে মিস্টার রস্টারের বিবাহের কথাবার্তা ভেঙে গিয়েছে। কী করে এটা সম্ভব হল?

মিস্টার রস্টারই সম্ভব করেছেন এটা। বেদেনী সেজে হাত গুনবার ছলে মিস্ ইনগ্রামকে তিনি বলেছিলেন—"রস্টারকে যত ধনী মনে হয় বার থেকে, তার অর্ধেকও তিনি নন। খোঁজ করলেই জানতে পারবে।"

খোঁজ করতে হয় নি মিস্ ইনগ্রামকে। মিস্টার রস্টারই মাঝে মাঝে মিথ্যে গুজব পৌঁছে দিয়েছেন ভদ্রমহিলার কানে। সেই সব গুজব শুনে শুনে কুমারীর বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছে রস্টারের উপরে। ছিঃ, যে-লোক বিবাহ করে পত্নীকে আকণ্ঠ বিলাসে ডুবিয়ে রাখতে পারবে না, তার আবার বিবাহের শখ কেন?

ধরা-বাঁধা নিয়মে বিবাহের প্রস্তাব কোনদিনই হয় নি। কাজেই বাহ্যিক অপ্রীতিকর গোলমাল কিছু না করেই উভয় পক্ষ পরস্পরের কাছ থেকে নিঃশব্দে সরে যেতে সক্ষম হল।

মিস্টার রস্টারকে উৎফুল্ল দেখলাম থর্নফিল্ডে ফিরেই। তিনি একটা ফাঁড়া কাটিয়েছেন যেন। উৎফুল্ল হলাম আমিও। কেন যে হলাম—তার কারণ আমার নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়।

আমি মিস্টার রস্টারের পক্ষপাতী, সেই প্রথম দর্শনের দিন থেকেই। কিন্তু আমি নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে সচেতন। সামান্য গৃহশিক্ষিকা মাত্র আমি, একজন অভিজাতবংশীয় ভদ্রলোক আমাকে বিবাহ করবেন; এমন আশা করতে পারি না—

কিন্তু কাকার চিঠিখানা? মাদিরা থেকে কাকা জন আয়ার তিন বৎসর আগে মিসেস্ রীডকে যে চিঠি লিখেছিলেন? মনে পড়ে সেই চিঠির কথা। মিসেস্ রীডের অন্তঃকরণ যদি এত নীচ না হত, যথাসময়ে যদি পত্রখানা আমাকে লোউডে পাঠিয়ে দিতেন, কিংবা আমার লোউড স্কুলের ঠিকানা যদি কাকাকে জানাতেন, তা হলে আজ তো আমি

অনায়াসে এক ধনী বণিকের উত্তরাধিকারিত্বে প্রতিষ্ঠিতা হতে পারতাম। তা হলে তখন মিস্টার রস্টারের অযোগ্যা পাত্রী বলে কেউ আমায় অগ্রাহ্য করতে পারত না।

কিন্তু, কী সব আবোল তাবোল চিন্তা। তিন বৎসর আগে পিতৃব্যের কাছে যদি চলে যেতাম আমি, তাহলে মিস্টার রস্টারের সঙ্গে এ জীবনে দেখাই তো হতে পারত না আমার!

সেই কি ভাল হত?

না, না, না। মনে মনে এটা ঠিক জানি—সে হত আমার পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি। জীবনে ওঁর সান্নিধ্যে কোনদিনই যদি আসতে না পারতাম, আমার নারীজীবন ব্যর্থ হত, তাতে এতটুকু সন্দেহ নেই। সূর্যকিরণে পদ্মিনী বিকশিত হয়, বিকশিত হওয়াতেই তার সার্থকতা। সূর্যের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যাওয়ার কল্পনা সে করে না। আমিও সে-কল্পনা করি নি। কিন্তু যে সার্থকতা আমি লাভ করেছি ওঁর কাছাকাছি আসতে পেরে, তার মূল্য পিতৃব্যের ধনৈশ্বর্যের চেয়ে নিশ্চয় বেশী।

ও চিন্তা ছেড়ে দিই। যা পেয়েছি, তাই আমার যথেষ্ট। মিস্ ইনগ্রাম এ বাড়িতে এলে, আমাকে এখান থেকে বিদায় নিতে হত, কারণ ও-রকম উদ্ধত, গর্বিতা মহিলার সঙ্গে এক সংসারে বাস করে আত্মসম্মান বজায় রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হত না কোনমতেই। কিন্তু সে আপদ কেটে গিয়েছে অপ্রত্যাশিতভাবেই। মিস্ ইনগ্রাম আর আসছে না এ বাড়িতে।

মিস্টার রস্টারের সঙ্গে সঙ্গে আমিও উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

কিন্তু আমার সে আনন্দে উত্তেজনা বা চাঞ্চল্য ছিল না, ছিল প্রশান্তি, ছিল কৃতার্থমন্যতা। উত্তেজনা, চরম উত্তেজনা যখন এল, তখন এল মিস্টার রস্টারের দিক থেকেই।

তিনি একদিন আমারই কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে বসলেন।

কল্পনাতীত! আমি আত্মহারা! স্বর্গে না মর্ত্যে আমি, তা বুঝতে পারছি না। আসন্ন সন্ধ্যার আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা, বাগানের একটা পুষ্পিত চেশ্‌নাটতরুর বাঁধানো বেদীতে বসে ছিলাম আমরা। এমনি সময়ে এল সেই পাগল-করা প্রস্তাব।

দ্বিধা ছিল, সংকোচ ছিল, অযোগ্যতার উপলব্ধি ছিল অতি প্রবল—

মিস্টার রস্টারের আবেগের প্লাবনে সব ভেসে গেল কোথায়—"যেদিন হে-লেন খালের ধারে পা-ভাঙ্গা রস্টারের সমুখে তুমি প্রথম এসে দাঁড়ালে, সেইদিনই জানি আমার জীবনের অমৃত-দূতী তুমি, ছন্নছাড়া এই দিশাহারা মানুষটাকে হাত ধরে স্বর্গের পথে তুলে নেবার জন্যই তোমার আবির্ভাব। আমার সব ভার তুমি নাও।"

গর্বে, পুলকে, পরম চরিতার্থতায় সে-ভার আমি নিলাম।

হাত-ধরাধরি করে দুজনে যখন বাড়ি ফিরলাম, তখন মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গতেই খবর পেলাম—বাগানের ফুলন্ত সেই চেশ্‌নাট গাছটা বজ্রাঘাতে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

অজানা বিভীষিকায় মনটা শিউরে উঠল। কিন্তু মিস্টার রস্টারকে সে বিভীষিকার আভাস দিতেই তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন আমার সমস্ত ভয়-ডর-সন্দেহকে। ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতের সঙ্গে মানুষের ভাগ্যের সম্বন্ধ কী? কুসংস্কার!

আমিও তাই বুঝলাম। বোঝালাম নিজেকে। বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেল। কোন আড়ম্বর না করে, এক রকম নিঃশব্দেই গ্রামের গির্জাতে বিবাহটি সমাধা হবে। উৎসব যা হবে, তা অনুষ্ঠানের পরে।

এসে পড়ল নির্ধারিত শুভদিন।

কাল বিবাহ, সকালে আটটায়। সাতটার ভিতরে আমায় তৈরী হয়ে নিতে হবে। সন্ধ্যার পরেই নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছি। আদেলির ভার এখন সোফি দাসীর উপরেই পড়েছে অনেকটা।

সকাল সকালই ঘুমিয়ে পড়লাম।

কত রাত্রে জানি না, কী কারণে জানি না—ঘুম আমার ভেঙে গেল। কাঁটা দিয়ে উঠল সারা গায়ে। ঘরের ভিতর একটা মানুষ। এক হাতে মোমবাতি নিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে।

মানুষ—মানে মেয়েমানুষ। লম্বা চওড়া পালোয়ানী গঠনের এক নারী। বিবর্ণ মুখ, হিংস্র চক্ষু।

সে-চক্ষুর দৃষ্টি আমার উপর থেকে সরে ধীরে ধীরে আলনার উপর গিয়ে পড়ল, যেখানে আমার বিবাহ সজ্জাগুলি থরে থরে সাজানো রয়েছে। হাতের মোমটি মেঝেতে বসিয়ে ঐ বীভৎস মূর্তি এগিয়ে গেল সেই আলনার দিকে, ওড়নাখানা টেনে নিয়ে লম্বা দুই ফালি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল এক কোণে। তারপর আবার এসে দাঁড়াল আমার

শয্যার কাছে, মোমবাতি হাতে নিয়ে। ঝুঁকে পড়ল আমার মুখের উপরে, তার গরম দুর্গন্ধ নিশ্বাস আমার কপালের উপর পড়ছে—আমি দারুণ আতঙ্কে জ্ঞান হারালাম।

সকালে উঠে প্রথমেই ভাববার চেষ্টা করলাম যে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু সে চেষ্টা যে একান্তই আত্মপ্রতারণা, তা বুঝতে একটুও দেরি হল না। ঐ যে গৃহকোণে পড়ে রয়েছে ওড়নার দুই টুকরো।

মিস্টার রস্টার সব শুনে বললেন—"অকারণ ভয় পেয়েছ। ও সেই হতভাগী গ্রেস পুল। ওর মাথায় যখন ছিট চাপে—"

"আমার উপর রাগ কিসের?"

মিস্টার রস্টার বিষণ্ণ ভাবে বললেন—"পাগলের রাগ যে কখন কার উপর হয়, কেন হয়, তা কি বলা যায় না কি? আমাকে ও পুড়িয়ে মারতে গিয়েছিল, তুমি জান। অতিথি মেসনকে ও ছোরা মেরেছিল, তাও দেখেছ। এ-সবের কোন কারণ নির্দেশ করতে পার? অকারণেই ও হিংস্র হয়ে ওঠে এক এক সময়। অনেকদিনের পুরোনো লোক, তাড়াতে পারি না। যাক, বিবাহটা চুকে গেলেই তো আমরা লণ্ডন চলে যাচ্ছি। যখন ফিরব, তখন ওর কথা চিন্তা করা যাবে।"

মনটা আশ্বস্ত হল ওঁর কথা শুনে।

সাজগোজ করে গির্জায় রওনা হলাম।

সঙ্গে কেউ গেল না বাড়ি থেকে। শুধু মিস্টার রস্টার ও আমি। অন্ততঃ মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স যাবেন, আমার আশা ছিল। কারণ তিনি শুধু গৃহকর্ত্রী নন, মিস্টার রস্টারের আত্মীয়ও বটে। তবু তিনি গেলেন না। আমি ক্ষুণ্ণ হলাম। আমি গোড়া থেকে লক্ষ্য করেছিলাম—আমার এই বিবাহের ব্যাপারটিকে তিনি—শুধু তিনি কেন, বাড়ির কেউই—খুব প্রসন্নভাবে নেন নি। সবাই শুনেছে আর গম্ভীর ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। আমি ভেবেছি—সামান্য গৃহশিক্ষিকার—তাদেরই স্তরের একজনের আকস্মিক এতখানি উন্নতিতে তাদের ঈর্ষার উদয় হয়েছে। অন্যের বেলায় যাই হোক, মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্সের ভিতর এই সংকীর্ণতা দেখতে পাব এ আশঙ্কা আমি করি নি।

গির্জায় মিস্টার রস্টার ও আমি পাশাপাশি দাঁড়ালাম। যথারীতি প্রাথমিক অনুষ্ঠানের পর পাদরি মহাশয় কণ্ঠস্বর উঁচু পর্দায় তুলে মামুলি প্রশ্ন করলেন—"মিস্টার এডওয়ার্ড ফেয়ারফ্যাক্স রস্টারের সঙ্গে কুমারী

জেন আয়ারের প্রস্তাবিত বিবাহে কোন দিক থেকে কারও আপত্তি করার কিছু নেই তো ?"

প্রশ্নটি একান্তই কথার কথা। আবহমান কাল বিবাহের পূর্বে পাদরিরা এ প্রশ্ন করে থাকেন, এবং কখনই এ-প্রশ্নের কোন জবাব কোন দিক থেকে আসে না।

কোনদিনই আসে না, আজ কিন্তু এল।

আমারই ভাগ্য, তা ছাড়া আর কি বলব ?

জবাব এল গির্জার দূরতম কোণ থেকে—"আপত্তি করার অতি সংগত কারণ আছে। এ বিবাহ হতে পারে না।"

এক মুহূর্ত সবাই স্তব্ধ। আমি পাথর বনে গেলাম, পাথর বনে গেলেন রস্টারও। সেই সঙ্গীন সময়েও আমার চোখে পড়ল—তাঁর মুখখানি কালো হয়ে গিয়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

পাদরি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন অন্য সবাইয়ের মত। কিন্তু তাঁর উপর এই মুহূর্তে অতি গুরু দায়িত্ব রয়েছে। তিনি আত্মসংবরণ করে যথাসম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে উঠলেন—"কে করেছে এ আপত্তি ? কিসের জন্য ? তাকে আমরা দেখতে চাই। কে আপনি ? এগিয়ে আসুন।"

এগিয়ে এল একটি লোক ধীরে ধীরে। রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল ; মুখের উপর রুমাল চাপা দেওয়া তার। "কে আপনি ?"—জিজ্ঞাসা করলেন পাদরি।

"নাম ব্রিগস, লণ্ডনের এটর্নি।"

"এ-বিবাহে আপনার কি আপত্তি ?"

"আপত্তি এই যে ধর্মশাস্ত্র এবং লৌকিক আইন—দুটোরই মতে এ-রকম বিবাহ নিষিদ্ধ।"

"এ-রকম, মানে কি রকম ?"

"এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ।"

"অসম্ভব।" বলে উঠলেন পাদরি—"মিস্টার রস্টার আমাদের প্রতিবেশী। অন্য স্ত্রী তাঁর থাকলে আমরা জানতাম না ?"

মিস্টার রস্টারের মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত উঁচু হয়ে উঠল—ব্রিগসের মাথা লক্ষ্য করে। ব্রিগস শশব্যস্তে সরে গেল—পাদরি চেঁচিয়ে উঠলেন—"মিস্টার রস্টার। মিস্টার রস্টার ! এটা যে পবিত্র স্থান, গির্জা, সেকথা ভুলে যাবেন না।"

মিস্টার রস্টার হাত নামালেন, মুখ তাঁর বজ্রগর্ভ মেঘের মত। ব্রিগস বলে যাচ্ছে—"অন্য স্ত্রী আছে মিস্টার রস্টারের, অন্ততঃপক্ষে তিনমাস আগে বেঁচে ছিল সে স্ত্রী। এই থর্নফিল্ডেই ছিল। মেসন এগিয়ে এস।"

এগিয়ে এল—থর্নফিল্ডের সেই অতিথি—যার আধ-মরা দেহ সমুখে নিয়ে আমাকে একটা গোটা রাত্রি কাটাতে হয়েছিল—থর্নফিল্ডের চারতলার ঘরে।

মেসন বলছে—"রস্টারের স্ত্রী হচ্ছে আমার ভগ্নী। ভাগ্যদোষে সে পাগল। রস্টার তাকে থর্নফিল্ডের বাড়ির চারতলায় রেখেছে, অতি গোপনে! আমি তাকে তিন মাস আগে দেখে গিয়েছি।"

রস্টার দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠলেন—"প্রিয় ভগ্নীর ছোরার আঘাত আর একটু গভীর হলে আজ তোমাকে এখানে এসে আমার সুখের পথে কাঁটা দিতে হত না। সেদিন তোমাকে বাঁচিয়েছিল এই জেন। আজ তারই সর্বনাশ করলে তুমি—"

মেসন কাতর হয়ে বলল—"এই অশাস্ত্রীয় বিবাহ হতে দিলেই কি মিস্ আয়ারের সত্যিকার সর্বনাশ হত না? বিশ্বাস কর—মিস্ আয়ারকে আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্য আমায় ছুটে আসতে হয়েছে মাদিরা থেকে। ওঁর কাকা আমার বন্ধু। তিনি বিবাহের খবর পেয়েছিলেন মিস্ আয়ারের কাছ থেকেই।"

মনে পড়ল কাকা বেঁচে আছেন কিনা, নিশ্চয় ভাবে না জানলেও বিবাহের পূর্বে তাঁকে একখানা পত্র দেওয়া আমি উচিত মনে করে-ছিলাম। যদি বেঁচে থাকেন, পাবেন, এবং আমায় আশীর্বাদ করবেন। আমার একমাত্র আত্মীয় তো তিনিই!

ওদিকে মেসন বলে চলেছে—"পত্র যখন পৌঁছালো, মিস্টার আয়ারের বাড়িতে তখন আমরা কয়েকজন সেখানে উপস্থিত। মনের আনন্দে তিনি তখন আমাদের বললেন—"আমার ভাইঝির বিয়ে হে! আমার দেহ এত অসুস্থ না হলে আমি যেতাম বিবাহে!"

"কথাপ্রসঙ্গে আয়ারের মুখ থেকেই শুনলাম—মিস্ আয়ারের কোথায় কার সাথে বিবাহ। আমি আঁতকে উঠে বললাম—"ভাই আয়ার! এ বিবাহ হতে পারে না, এ বিবাহ হতে দিও না। এ বিবাহ সিদ্ধ হবে না, কারণ রস্টারের এক স্ত্রী বর্তমান আছে।"

"তখন আয়ারই আমায় বিশেষ অনুরোধ করে পাঠিয়ে দিলেন—এ বিবাহ বন্ধ করবার জন্য। তা নইলে, আমার ভগ্নীর মুখ চেয়ে কোন কিছু আমি করতাম না। সে দুর্দান্ত পাগল, রস্টার আর একটা বিবাহ করলে তার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

* * *

ফিরে এলাম। বিবাহ হল না।

সদ্যোবিবাহিত দম্পতিকে অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য বাড়ির লোকজন হলঘরে সমবেত হয়েছিল, তাদের মধ্য দিয়ে আমরা নীরবে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। আমাদের মুখের চেহারা দেখে দাসদাসীরা কেউ কোন কথা কইতে সাহস পেল না।

মিস্টার রস্টার, আমি, মেসন, ব্রিগস ও পাদরি।

দোতলা, তিনতলা, চারতলা—

গ্রেস পুল বসে সেলাই করছে। আজ গ্রেস পুলকে নতুন চোখে দেখলাম। এতদিন তাকে পাগল বলে জানতাম। যে পাগলের মাথায় খুন চাপে মাঝে মাঝে! আজ জেনেছি—সে নিরীহ পাহারা-ওয়ালী মাত্র। একটা দুর্দান্ত উন্মাদকে আগলে নিয়ে বসে আছে, সমাজ সংসারের গণ্ডীর বাইরে।

মিস্টার রস্টার জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার রোগী কেমন, গ্রেস?"

"মাঝামাঝি কর্তা"—সংক্ষেপে উত্তর দিল গ্রেস পুল।

মিস্টায় রস্টার ওদিকের দরজাটা খুলে ফেললেন। আবছা আলোতে যাকে দেখা গেল, তাকে মনে হল একটা চতুষ্পদ জানোয়ার। চার হাত-পায়ে হামা দিচ্ছে মেঝেতে। আমাদের দেখেই সেই চতুষ্পদ সহসা সটান খাড়া হয়ে দাঁড়াল, মিস্টার রস্টার তাড়াতাড়ি আমাকে ঠেলে পিছনে সরিয়ে দিলেন। অন্য সবাই নিজেরাই সাবধান হল, বিশেষতঃ মিস্টার মেসন। ভগ্নীর স্নেহ-সম্ভাষণের স্বাদ সে ইতি-পূর্বেই একবার পেয়েছে কিনা?

চতুষ্পদটি খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই দেখা গেল সে এক লম্বাচওড়া স্ত্রীলোক—কী হিংস্র তার চোখের চাউনি! চিনতে এক মুহূর্তও দেরি হল না। এই সেই মূর্তি, যে গতরাত্রে আমার ঘরে ঢুকে ওড়না ছিঁড়ে দিয়ে এসেছিল।

"বার্থা!" ব'লে মিস্টার রস্টার ডাক দিতেই উন্মাদিনী ঝাঁপিয়ে

এসে পড়ল তাঁর উপরে, দু'হাত বাড়িয়ে লম্বা লম্বা নখ দিয়ে যেন তাঁর টুটি ও ছিড়ে ফেলবে। কী অসাধারণ শক্তি ওর শরীরে। মিস্টার রস্টারের মত বলবান পুরুষও তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছেন না। অবশ্য তাঁর পক্ষে এ শুধু আত্মরক্ষার লড়াই, উলটে আঘাত করবার চেষ্টা করলে বার্থাকে তিনি হয়ত সহজে আয়ত্ত করতে পারতেন।

অবশেষে বার্থার দুই হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিতে সক্ষম হলেন তিনি। গ্রেস দড়ি এগিয়ে দিল। চেয়ারের সঙ্গে তাকে বেঁধে রেখে, মেসন, ব্রিগস্ আর পাদরির দিকে তাকালেন রস্টার—"এই দেখুন—এই আমার সেই স্ত্রী, যে বেঁচে আছে বলে আমি অন্য স্ত্রী গ্রহণে অক্ষম।"

পাগলীর মুখ দিয়ে তখন ফেনা বেরুচ্ছে, গজরাচ্ছে, ক্রুদ্ধ নেকড়ের মত। মিস্টার রস্টারকে সে দগ্ধ করে ফেলতে চাইছে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে।

মিস্টার রস্টার বলছেন—"জ্যামেকাতে এই মেসনদের বাড়ি। আমার বাবার সঙ্গে বার্থার বাবার বন্ধুত্ব ছিল; কিন্তু দীর্ঘদিন দেখাসাক্ষাৎ ছিল না। আমি বাবার ছোট ছেলে, পৈত্রিক সম্পত্তি আমার প্রাপ্য নয়। তাই বাবা আমার জন্য ধনবতী পাত্রী খুঁজছিলেন। বন্ধু মেসনের অনেক অর্থ—মেয়েও একটি আছে তার। জ্যামেকাতে বেড়াতে যাওয়ার জন্য আমি নিমন্ত্রণ পাই বার্থার বাবার কাছ থেকে। সেখানে গিয়ে বার্থাকে দেখি—নবযৌবনা তরুণী। আগ্রহটা ওদের তরফেই ছিল বেশী, আমি কিছু বুঝে উঠতে পারবার আগেই বিবাহ হয়ে গেল। তখন বার্থার মা ওখানে নেই, শুনেছিলাম তিনি ইউরোপে দেশভ্রমণ করছেন। বিবাহের পরে শুনলাম—তিনি ঘোর উন্মাদ, জ্যামেকাতেই কোন পাগলা-গারদে রয়েছেন দীর্ঘ দিন ধরে।

"শুধু তাই নয়, বার্থাও না কি মাঝে মাঝে পাগল হয়, শুনলাম। আমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়ের সময়টাই কিছুদিন সে প্রকৃতিস্থ ছিল। তারপর সে আবার পাগল হয়ে গেল। চিকিৎসার জন্য আমি তাকে নিয়ে এলাম ইংলণ্ডে। রোগ সারল না। এদিকে আমার বাবা ও দাদা দুই জনই তখন মারা গিয়েছেন—আমি বার্থাকে থর্নফিল্ডে এনে গোপনে চার তলার ঘরে আটক করে রাখলাম গ্রেস পুলের তত্ত্বাবধানে। গ্রেস অসতর্ক হলেই ও ঘরের চাবি চুরি করে গ্রেসের পকেট থেকে, আর তালা খুলে নীচে চলে যায় আমাকে খুন করবার জন্য। নিজের

আত্মীয়দের উপরেই ওর বদ্ধমূল ক্রোধ, মেসনকে দেখা মাত্রই তাকে ছোরা দিয়ে জখম করেছিল, সে ক্ষতচিহ্ন এখনও মেসনের গলায় দেখতে পাবেন।"

কথা শেষ করে রস্টার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন—"বার্থার বাবার এবং আমার বাবার চক্রান্তে জীবনটা আমার ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সরলা কিশোরীকে বিবাহ করে নতুন সংসার পাতবার একটা চেষ্টা করব ভাবছিলাম, তাও পাঁচ জনে হতে দিলে না। কী জানি, এ বিবাহ হলে ইহকালে বা পরকালে কার কী ক্ষতি হত, বুঝি না। যাক, আপনারা তা হলে আসুন এখন।"

সবাই বিদায় হয়ে গেল নীরবে। কেবল মেসন আমাকে চুপি চুপি বলে গেলেন—"আপনার কাকাকে আমি সব বলব, আর আপনি যাতে অবিলম্বে তাঁর কাছে চলে যেতে পারেন, তার ব্যবস্থা করবার জন্য অনুরোধ করব। অবশ্য যে-রকম অসুস্থ তাঁকে দেখে এসেছি, তাতে তিনি এখনও জীবিত আছেন কিনা, জানি না।"

ওঁরা বিদায় হয়ে গেলেন।

দিন কেটে গেল। আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে সারা দিন বসে আছি। আকাশ পাতাল ভাবছি। এখন আমি কী করি? থাকা উচিত হবে না, নিরাপদ হবে না।

মিস্টার রস্টারকে আমি ভালবাসি। এই ভালবাসাই আমাকে পাপের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারে। না, এ প্রলোভনকে জয় করতে হলে এখান থেকে পালানোই আমার উচিত।

আমি পালালাম। সেই রাত্রেই।

নয়

মাঠবন ভেঙে, সুড়ি সুড়ি গলিঘুঁজির ভিতর দিয়ে রাস্তায় এসে যখন পৌঁছোলাম, তখন সূর্য সবে উঠছে। দেহ যত না পরিশ্রান্ত, অন্তর অবসন্ন তার চেয়ে অনেক বেশী—অবসন্ন, বিষণ্ণ, মুহ্যমান। মিস্টার রস্টারের কথা মনে হয়, আর বুকটা ভেঙে যেতে চায় অসহ্য বেদনায়। এতক্ষণ হয়ত তিনি টের পেয়েছেন যে আমি বাড়ি ছেড়ে

চলে এসেছি। সে-উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে জগৎটা শূন্য হয়ে যাবে তাঁর কাছে, তা আমি বুঝতে পারছি। তাঁর সে নৈরাশ্য আমার হৃদয়ের ভিতর অনুভব করছি আমি। ফিরে যাবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠছি ক্ষণে ক্ষণে। ফিরে গিয়ে যদি বলি—"না, আমি যাই নি, আবার এসেছি আমি—?" তা হলে এক্ষুণি কি দুটি হৃদয় অনির্বাণ পুলকে দীপ্ত হয়ে উঠবে না ?

উন্মুখ হয়ে উঠি, কিন্তু তবু ফিরি না। কে যেন আমাকে চাবুক মেরে মেরে থর্নফিল্ডের উলটোমুখে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। জ্বলতে জ্বলতে, চোখের জল ফেলতে ফেলতে তবু আমি ছুটতেই থাকি—দূরে, আরও দূরে—বাঞ্ছিত দয়িত প্রিয়তমের সান্নিধ্য থেকে বহু দূর দূরান্তরে !

এখন ভাবি—সেদিন কে আমাকে অমন করে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল ? উত্তর পাই হৃদয়ের ভিতরেই। সে আমার ভগবান ছাড়া কেউ নয়। ক্ষুদ্র তৃণটিও যাঁর দৃষ্টির প্রসাদে বঞ্চিত নয়, এই তৃণাদপিতুচ্ছ নারীকেও তাঁরই মঙ্গলদৃষ্টি আসন্ন সর্বনাশের কবল থেকে রক্ষা করেছিল সেদিন।

বড় রাস্তায় পৌঁছেই একখানা খালি গাড়ি পেলাম। চালককে জিজ্ঞাসা করলাম সে কোথায় যাবে। যে-স্থানের নাম সে করল—সে আমার অজানা। যেতে কয়দিন লাগবে ?—দুই দিন। ভাড়া কত নেবে ?—ত্রিশ শিলিং। আমার সম্বল মাত্র বিশ শিলিং। সে-কথা তাকে বলতে একটুখানি ভেবে সে বলল—"তাই দেবেন।"

গাড়িতে উঠে বসলাম ছোট্ট পোঁটলাটি হাতে নিয়ে। তার ভিতর একখানা রুটি, এক বোতল জল আর দুই একটা জামা। দুটো দিন সেই রুটিজল খেয়ে কাটিয়ে দিলাম। কাটিয়ে দিলাম শুধু কেঁদে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তৃতীয় দিন প্রভাতে চালক আমায় হুইট ক্রস্ নামে একটা জায়গায় নামিয়ে দিল—"বিশ শিলিং-এ আর বেশী দূর নিয়ে যেতে পারব না।" তর্ক করবার শক্তি ছিল না। নিঃশব্দে নেমে পড়লাম, কাপড় জামার পুলিন্দাটি গাড়িতে ফেলেই।

গাড়ি চলে গেল। একা, একবস্ত্রে, কপর্দকশূন্য অবস্থায় একান্ত অচেনা স্থানে আমি শোকবিহ্বলা রমণী। চোখের জলে পথ দেখতে পাই না এক এক সময়ে, তবু পথ চলি।

শহর নয়, ছোট পাড়াগাঁ। দুই চার ঘর চাষী কৃষাণের বাস। দুই

একখানা দোকানও আছে। কাজ খুঁজি। এখানে কাজ কে দেবে?

বেলা বাড়ে, ক্ষুধাও বাড়ে।

জীবনে দুঃখ কম পাই নি, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা এর আগে সহ্য করতে হয় নি কখনও। এ জ্বালা অসহ্য মনে হয়।

দুটো দিন সেই জ্বালায় জ্বলেছি। একবার গ্রাম ছেড়ে মাঠে যাই, আবার মাঠ পেরিয়ে অন্য গ্রামে গিয়ে উঠি। রাত কাটাই মাঠের ভিতর। দিনের বেলায় এ-বাড়ি ও-বাড়িতে যাই কাজের সন্ধানে। কাজ তো দেয়ই না কেউ, এমন কথাও বলে না—"নাও, এই রুটিখানা খেয়ে ফেল।" আমি মুখ ফুটে বলতেও পারি না—"ভিক্ষা দাও।"

দুই দিন এমনি কেটে গেল যখন, তখন আমি ধুঁকছি। সন্ধ্যা বেলায় তখন আমি এক দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠের ভিতর। ভাবলাম—"আর হেঁটে কি হবে, এইখানে শুয়ে পড়ি, রাত্রে যদি প্রাণটা এইখানেই বেরিয়ে যায় তো বাঁচি।"

ঠিক এমনি সময়ে বহুদূরে দেখতে পেলাম একটা আলো। প্রথমে মনে হল—আলেয়া। কিন্তু আলেয়ার আলো কখনো জ্বলে, কখনো নেবে, নড়ে চড়ে বেড়ায়। এ তো সে রকম নয়। একভাবে মিটমিট করছে একই জায়গায়। নিশ্চয় কোন গৃহস্থবাড়ির আলো।

কত গৃহস্থের দোরেই তো হানা দিয়েছি এই দুই দিনে। কোথাও তো আশ্রয় বা অনুকম্পা পাই নি। তবে এখানেই বা ভরসা কী? কী হবে মাঠ ভেঙে ওখানে গিয়ে?

কিন্তু আশা মানুষের যায় না। আমি টলতে টলতে চলতে শুরু করলাম সেই আলো লক্ষ্য করে তন্দ্রাচ্ছন্নের মত। কষ্ট অনুভব করবার শক্তি পুরোপুরি সজাগ থাকলে দেহের ঐ অবস্থায় অত বড় প্রকাণ্ড মাঠ পেরিয়ে আমি সেখানে পৌঁছোতে পারতাম না।

যখন ও বাড়িতে পৌঁছে কড়া নাড়লাম, বেরিয়ে এল এক আধা-বয়সী দাসী। যথারীতি সে আমাকে হাঁকিয়েই দিচ্ছিল, এমন সময় বাইরে থেকে গৃহস্বামী এসে উপস্থিত। তিনি আমার অবস্থা বুঝলেন বোধ হয়। দাসীকে নিরস্ত করে আমায় ভিতরে নিয়ে গেলেন। আশ্রয় পেলাম।

সেই রাত্রেই আমি ঘোরতর অসুখে পড়ে গেলাম। তিনদিন জ্ঞান

ছিল না বললেই হয়। মাঝে মাঝে বিকারের ঘোরে মনে হত—ছুটি সুন্দরী কিশোরী—আমারই বয়সী—ঘরের ভিতর ঘোরাফেরা করছে, চামচ করে খাবার দিচ্ছে আমার মুখের ভিতর।

জ্ঞান হল তিনদিন পরে। সুস্থ হয়ে উঠতে আরও কয়েকদিন লাগল।

এই কয়েকদিনে বাড়ির লোকদের পরিচয় কতকটা জানতে পেরেছি।

গৃহস্বামী সেণ্টজন রিভার্স—পাদরি। তাঁর ছুই বোন—মেরী আর ডায়না—লণ্ডনে থাকে। বিভিন্ন বাড়িতে ছুইজনেই গৃহশিক্ষিকা। নিজেরাও পড়াশুনা করে। চতুর্থ প্রাণীর সেই দাসী হানা—যে আমাকে সেদিন তাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল।

সম্প্রতি পিতৃবিয়োগ হয়েছে এদের। সেই উপলক্ষেই তিন ভাই বোন একত্র হয়েছে এসে। কয়েকদিনের ভিতরই মেরী আর ডায়না চলে যাবে লণ্ডনে, সেণ্টজন ফিরে যাবেন তাঁর কর্মস্থানে মর্টন গ্রামে, মাত্র মাইল তিন এখান থেকে।

আগে বুড়ো মিস্টার রিভার্স থাকতেন বাড়িতে, দাসী হানাকে নিয়ে। এখন তিনি নেই, কাজেই হানা এবার সেণ্টজনের সঙ্গে চলে যাবে মর্টনের গির্জাবাড়িতে। এই বাড়ি পড়ে থাকবে তালাবন্ধ হয়ে।

সেণ্টজন যুবা পুরুষ, অসামান্য সুপুরুষ। গ্রীক দেবতার মত চেহারা। একনিষ্ঠ যাজক, ধর্মোন্মাদ বললেই হয়। জীবনের একমাত্র উচ্চাশা হল এই যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতবর্ষে চলে যাবেন। তারই জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষা করছেন।

আমার পরিচয় চাইলেন সেণ্টজন।

আমি বললাম—"আপাততঃ আমায় মিস্ জেন ইলিয়ট বলে জানুন। এ নাম অবশ্য আমার সত্যিকার নাম নয়, তা অকপটেই স্বীকার করছি। নিজের নামধাম আমি গোপন রাখতে চাই আপাততঃ। অবশ্য ধাম বলতে কিছু নেই আমার। ত্রিসংসারে কেউ নেই, এক পিতৃব্য ছাড়া। তিনি দূরদেশে থাকেন, জীবনে তাঁকে দেখিনি, তিনিও অসুস্থ ছিলেন সম্প্রতি, এখনও বেঁচে আছেন কিনা, সন্দেহ। সর্বশেষ যেখানে ছিলাম, সেখান থেকে বিশেষ কারণে গোপনে চলে এসেছি। সেখানকার লোকেরা যাতে আমার সন্ধান না পায়, সেইজন্যই আমার

পরিচয় গোপন রাখা। তবে এটা আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলতে পারি যে কোন অন্যায় কাজ বা অপরাধ করে আমি সেখান থেকে পালাই নি। বরং পালিয়েছি যাতে একটা সম্ভাব্য অন্যায়কে অঙ্কুরেই নষ্ট করা যায়, সেইজন্য। লজ্জা বা ভয় করবার মত কাজ কোনদিন করিনি—এটা বিশ্বাস করতে পারেন।"

ওরা নিজেরা লোক ভাল, কাজেই আমাকে অবিশ্বাস করল না। কেবল জানতে চাইল—তাদের দ্বারা আমার কোন উপকার হতে পারে কিনা।

"উপকার যা করেছেন আপনারা, তারই সাহসে আরও একটু উপকার আশা করছি বই কি আমি! আমাকে কোন একটা কাজ খুঁজে দিন। আমি লেখাপড়া জানি। লোউড স্কুলে আট বৎসর ছিলাম—ছয় বৎসর ছাত্রীরূপে, দুই বৎসর শিক্ষিকারূপে। শেষ যেখানে ছিলাম, সেখানেও আমায় গৃহশিক্ষিকার কাজই করতে হত।"

সেণ্টজন ভেবে উত্তর দিলেন—"তাহলে একটা কাজ আমি আপনাকে দিতে পারি হয়ত। মর্টনে আমার গির্জার তত্ত্বাবধানে চাষীদের মেয়েদের জন্য একটি পাঠশালা খোলা হচ্ছে। সেখানে শিক্ষিকা নিযুক্ত করবার ভার আমারই উপর। আপনি যদি সেই কাজ নেন, অবশ্য অতি নগণ্য কাজ। তবে মাথা গুঁজে থাকবার বাড়ি পাবেন একখানা, আর গরিবভাবে একা মানুষের গ্রাসাচ্ছাদন চলতে পারে এমন একটা বেতন—"

বলা বাহুল্য আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম।

মার্শ-এণ্ড (এই বাড়ির নাম) তালা বন্ধ করে বেরুবার আয়োজন নিয়ে সবাই ব্যস্ত, এমন সময়ে বাড়িতে আর একটা দুঃসংবাদ এল এদের। এদের মামা মারা গিয়েছেন। দূর দেশে থাকতেন, নিঃসন্তান। অর্থবান লোক, এদের আশা ছিল—মামার সম্পত্তি তাঁর অবর্তমানে এরাই পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য একা আসে না, মামা মরবার সময় এদের কিছুই দিয়ে যান নি, উত্তরাধিকারিণী করে গিয়েছেন অন্য কোন্ আত্মীয়াকে।

নিজেদের দুঃখের কথা আমাকে সবিস্তারে বলতে এদের সংকোচ হচ্ছে দেখে আমিও আর এ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলাম না। তবে দুঃখ হল মেরী আর ডায়নার জন্য। মামার কাছ থেকে কিছু অর্থ

পেলে এমন চমৎকার দুটি মেয়ে গৃহশিক্ষিকার মর্যাদাহীন জীবনযাত্রা থেকে মুক্তি পেত! সে-অর্থ থেকে এদের বঞ্চিত করার দরুন সেই মামার উপর বেশ একটু রাগই হল আমার।

* * *

মার্শ-এণ্ড তালা বন্ধ হল। মেরী আর ডায়না লণ্ডনে চলে গিয়েছে। আমি যেন স্নেহময়ী দুটি ভগিনীর সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম। কী স্নেহের চোখেই ওরা দেখেছিল আমাকে!

কিন্তু বিষাদের বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিজের জীবনযাত্রা শুরু করতে হল পরিপূর্ণ উদ্যম নিয়ে। সেণ্টজন আমাকে মর্টনের স্কুলবাড়িতে এনে তুললেন।

নতুন পাঠশালা। একটা পুরোনো খামারবাড়িকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়া হয়েছে। একখানি ঘরে পড়ুয়ারা বসবে, একখানি ঘরে শিক্ষিকার বাসস্থান হবে। সমস্ত খরচা বহন করেছেন মিস্ রোজামণ্ড অলিভার। এ অঞ্চলের একমাত্র ধনী মিস্টার অলিভারের মেয়ে।

ঘরবাড়ি দেখে বেশ পছন্দ হল আমার। আলো-হাওয়া প্রচুর। আসবাবপত্র সামান্য হলেও প্রয়োজন মিটবার মত। প্রায় চল্লিশটি মেয়ে এল ভরতি হতে। পনেরো ষোল বৎসরের বড় বড় মেয়ে থেকে তিন চার বৎসরের খুকি পর্যন্ত। কেউ কিছুই জানে না। পড়াশুনার রেওয়াজ বংশপরম্পরায় এদের ভিতর নেই। সেণ্টজনই এ চিন্তা ঢুকিয়েছেন এদের মাথায়। পাদরি মশাই নিজে এত জনপ্রিয় না হলে এ পাঠশালা তিনি গড়ে তুলতে পারতেন না কোনমতেই।

আমি কাজ শুরু করে দিলাম। শিক্ষকতার কাজ আমার পক্ষে নতুন নয়। লোউডে থর্নফিল্ডে ঐ কাজই এতদিন করেছি। আনন্দ পাই এতে। আশা হল জীবনের ছেঁড়া তার জোড়া দিয়ে নিয়ে আনন্দেই দিন কাটাতে পারব এই চাষী বালিকাদের নিয়ে। মেয়েগুলি আন্তরিক ভদ্র। আমাকে দুই একদিনের ভিতরই আপন করে নিল।

সেণ্টজন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন আমার কার্যকলাপ, তা আমার অগোচর ছিল না। এ রকম দুঃস্থ পরিবেশ আমার ভাল লাগবে কিনা, বোধহয় সন্দেহ ছিল ওঁর। ক্রমে ক্রমে লক্ষ্য করলাম ওঁর চোখে মুখে একটা নিশ্চিন্ততার আভাস। অর্থাৎ আমার সাফল্য সম্বন্ধে উনি আশান্বিত হয়ে উঠেছেন।

মিস্ রোজামণ্ড অলিভারকে দেখলাম। ঘোড়ায় করে বেড়াতে এসেছেন। আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে। আর তেমনি হাসিখুশী। প্রথম দিনেই আমার সন্দেহ হল মেয়েটি সেণ্টজনের অনুরাগিণী, আর সেই অনুরাগের আকর্ষণেই অর্থব্যয় করে এই পাঠশালা স্থাপন করেছেন।

ক্রমে আমার ধারণা বদ্ধমূল হল।

তেমনি এটাও বুঝতে পারলাম যে সেণ্টজনের তরফ থেকে এ অনুরাগের প্রতিদান নেই। অর্থাৎ আকর্ষণ আছে, কিন্তু সে আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়ার দিকেই সেণ্টজনের ঝোঁক। প্রথমটা আমার কাছে প্রহেলিকা বলে মনে হত এ মনোভাব। কিন্তু পরে বুঝেছিলাম।

প্রটেস্টাণ্ট পাদরিদের বিবাহ করা নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু সেণ্টজন মনে করেন না যে রোজামণ্ড অলিভার কোন ধর্মযাজকের উপযুক্ত পত্নী হতে পারে। সে বিলাসে লালিতা, খেয়াল তার প্রকৃতি, কৃচ্ছ্রসাধনের ব্রত তার পক্ষে একান্ত অনুপযোগী। অথচ সেণ্টজন মিশনারীর কর্তব্য মাথায় তুলে নিয়ে বাঘ আর সাপের লীলাক্ষেত্র ভারতে যেতে বদ্ধপরিকর। রোজামণ্ডের মত জীবনসঙ্গিনীকে সাথে নিয়ে তো সে দেশে শুধুই বিব্রত হতে হবে।

একটুখানি ঘনিষ্ঠতা যখন হল সেণ্টজনের সঙ্গে—কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষয়িত্রী বলে সেণ্টজন দুই চার দিনের মধ্যেই আমাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করলেন—তখন আমি এক সুযোগে রোজামণ্ডের কথা তুললাম। অর্থাৎ কথা যা বলবার, আমিই বলে যাচ্ছি এক তরফা। সেণ্টজন পাথরের মূর্তির মত নিশ্চুপ। ভাবে ভঙ্গীতে, দুই একটা অর্ধস্ফুট উক্তিতে সেদিনই আমি উপলব্ধি করলাম সেণ্টজনের মনোভাব। অর্থাৎ রূপ তাঁকে আকৃষ্ট করেছে বটে, কিন্তু রূপের আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করার মত দুর্বলচিত্ত লোক সেণ্টজন নন।

* * *

দিন যায়। যতক্ষণ মেয়েরা স্কুলে থাকে, আনন্দে থাকি আমি। ছুটির পরে আর সময় কাটে না যেন। নিজের গেরস্তালির কাজ আর কতটুকু! তাও বড় মেয়েদের ভিতরই একজন আমার ধোয়ামোছার কাজগুলি করে দিয়ে যায়। সেজন্য সে বিনা বেতনে পড়তে পায়। সামান্যই মাইনে মেয়েদের। কিন্তু তাও তো অনেকে দিতে পারে না!

যা বলছিলাম—কাজ কিছু নেই। কাজেই ছবি আঁকার দিকে

মন গেল আমার। তাও যখন ভাল লাগে না, তখন নিজের মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলি। বিগত জীবনের কথা ভাবি। গেট্‌সহেড, লোউড, থর্নফিল্ড, হেলেন, মিস্ টেম্পল, আদেলি। আদেলির কথাই বেশী মনে পড়ে। এবং তারও চেয়ে বেশী মনে পড়ে—সর্বদাই মনে পড়ে—আর একজনের কথা।

অর্থাৎ আমার প্রভুর কথা—মিস্টার রস্টারের কথা।

তাঁকে ছেড়ে এসেছি, কিন্তু ত্যাগ করে আসিনি। তাঁর স্মৃতি চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে আকৃষ্ট করে আছে। কী করছেন তিনি আমাকে হারিয়ে? হায়, খবর পাওয়ার যে কোনই উপায় নেই! খবর পাওয়ার পথ যে আমিই বন্ধ করে এসেছি চিরদিনের জন্য। আমি যে এখানে এসে অজ্ঞাতবাস করছি, তা প্রভু জানবেন কেমন করে? আর আমি বা এখানে বসে কেমন করে খবর নেব থর্নফিল্ডের? সেণ্টজনকে বললে তিনি অবশ্য এখনই সংবাদ আনতে পারেন, কিন্তু আমার পূর্ব-ইতিহাস যে আমি জানাজানি হতে দিতে চাই না! দিলে মিস্টার রস্টারের কাছে আমার এ গোপন বাসস্থানের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে যে!

এমনি যখন মনের অবস্থা আমার, তখন একদিন সন্ধ্যার সময় একটা ব্যাপার ঘটল। সেণ্টজন এলেন বেড়াতে। চেয়ারে বসে টেবিলের উপরকার প্যাডটা নাড়াচাড়া করছেন। হঠাৎ তিনি কী দেখে যেন চমকে উঠলেন একেবারে। আমি স্পষ্ট দেখলাম তিনি চমকে উঠলেন। একবার প্যাডের দিকে, একবার আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। তারপর প্যাড থেকে উপরের কাগজখানার একটা কোণ ছিঁড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাড়াতাড়ি বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। আমি অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর গমনপথের দিকে। তাঁর এ আচরণের কোন হেতুই বুঝলাম না।

বুঝতে পারলাম পরের দিন। তেমনি সন্ধ্যাবেলায়।

সেণ্টজন আবার এলেন। একটা গল্প ফাঁদলেন। এক পরিবারের দুই ভাই ছিল, আর এক বোন। বড় ভাই এক বড়লোকের মেয়েকে বিবাহ করেন। অল্পদিন পরেই তিনি মারা যান, তাঁর স্ত্রীও মারা যান। রইল এক শিশুকন্যা। দুঃখে কষ্টে মানুষ হতে লাগল মামার

বাড়িতে। সে মামাও মারা গেলেন যখন, তখন মেয়েটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল এক দাতব্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

আমি কান খাড়া করে শুনছি।

ছোট ভাই দূরদেশে গিয়ে বাণিজ্যে মন দিলেন। সারাজীবনের পরিশ্রমের ফলে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে সম্প্রতি তিনি সেই দূর বিদেশেই মারা গিয়েছেন।

আর, ঐ দুই ভাইয়ের যে বোনটি ছিলেন, তাঁর বিবাহ হয় এই অঞ্চলেই এক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি মারা গিয়েছেন বহুদিন আগে, তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে সম্প্রতি।

এখন দূর দেশবাসী সেই ছোট ভাইটি তাঁর সমস্ত অর্থ দান করে গিয়েছেন নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। ভাগিনেয়-ভাগিনেয়ীদের কিছুই দিয়ে যান নি।

আমি হতচেতনের মত গল্প শুনছি। এ কি গল্প? না, আমারই পারিবারিক কাহিনী? তাই যদি হবে, তবে এ কাহিনী সেণ্টজন কোথা থেকে জানলেন?

গল্পের উপসংহারে সেণ্টজন বললেন—"পিতৃব্যের উত্তরাধিকারিণী সেই মেয়েটি কিন্তু নিখোঁজ। তাকে খুঁজে বার করবার জন্য এটর্নিরা আকাশপাতাল আলোড়ন করে বেড়াচ্ছে। এমন কি, অজ পাড়াগাঁয়ের গরিব পাদরি এই যে আমি—সেণ্টজন রিভার্স—আমার কাছেও চিঠি লিখেছে এটর্নি। এতদিন আমিও খোঁজ পাইনি তবে—"

"তবে?"—রুদ্ধশ্বাসেই প্রশ্ন করি আমি।

"আজ মনে হচ্ছে—আমি খোঁজ পেয়েছি। দৈবাৎই পেয়েছি। এটর্নিকে নিখোঁজ উত্তরাধিকারিণীর নাম ঠিকানা জানাবার আগে আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিতে চাই—"

অস্ফুট উক্তি আমার কণ্ঠ থেকে—"আমাকে?"

"হ্যাঁ, একটা মাত্র কথা। এই নামই তো তোমার আসল নাম?" —এই বলে কাল সন্ধ্যায় আমার প্যাডের যে কাগজটুকু ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেইটুকু আমার সামনে মেলে ধরলেন সেণ্টজন। দেখি —তাতে স্পষ্ট অক্ষরে আমার নিজের হাতে লেখা রয়েছে নিজের আসল নাম "জেন আয়ার"!

অর্থাৎ অলস মুহূর্তে, একান্ত অন্যমনস্কভাবে কখন প্যাডের উপর

হিজিবিজি দাগ কাটতে কাটতে নিজের নামটুকু লিখে ফেলেছিলাম, নিজেও তা টের পাই নি।

গ্রন্থি যখন খোলবার হয়, তখন এমনিভাবেই খুলে যায়।

*　　*　　*

উত্তরাধিকারিণী! কাকার উত্তরাধিকারিণী আমি হব—তা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। হঠাৎ থর্নফিল্ড থেকে পালাতে না হলে হয়ত পিতৃব্যের মৃত্যুর আগে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতেও পারতাম।

কিন্তু বিশ হাজার পাউণ্ডের উত্তরাধিকার—সেণ্টজনের কাছেই শুনলাম অর্থের পরিমাণটা—পাওয়ার আনন্দের চাইতেও আরও একটা গভীরতর আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে উঠলাম। সেণ্টজন আমার পিসতুতো ভাই তাহলে। মেরী আর ডায়না—পরিচয় না জেনেও যাদের বোনের মত ভালবেসেছিলাম—তারা আমার বোনই সত্যি সত্যি!

এ কী সৌভাগ্য! এ কী আনন্দ!

দশ

উত্তরাধিকারের বিশ হাজার পাউণ্ড আমি একা ভোগ করতে রাজী নই। কাকা যেমন আমার ছিলেন কাকা, তেমনি ছিলেন সেণ্টজনেদের মামা। কেন তিনি ওদের তিন ভাই বোনকে একেবারে বঞ্চিত করে গিয়েছেন, তাও শুনলাম। কবে নাকি আমার পিসেমশাই অর্থাৎ স্বর্গীয় মিস্টার রিভার্সের সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারে তাঁর কী মতান্তর হয়েছিল। তারই জ্বালা সারা জীবনেও তিনি ভুলতে পারেন নি। শোধ তুলে গিয়েছেন তিন ভাগনে-ভাগনীর উপরে।

এ অন্যায়ের প্রতিকার, সৌভাগ্যক্রমে আমার হাতেই আছে। আর সে প্রতিকার করবার প্রবৃত্তি যাতে আমার অন্তরে আসে, তারই জন্য বিধির নির্বন্ধে আমার মার্স-এণ্ড ভবনে আগমন। পরিচয় না ঘটলে, অতি দুর্দিনে আমার জীবনের জন্য ওদের কাছে ঋণী হতে না হলে ওদের প্রতি আমার এ স্নেহ আসত কোথা হতে? তাই দুনিয়ায় এত স্থান থাকতে আমি যে হুইটক্রসেই এসে পড়েছিলাম, এর ভিতরে আমি ভগবানের ইঙ্গিত দেখতে পেলাম।

আমি ঐ বিশ হাজার পাউণ্ডকে সমান চার ভাগে বিভক্ত করলাম। ওরা তিন ভাইবোন আর আমি—প্রত্যেকে নিলাম পাঁচ হাজার পাউণ্ড করে। ওরা অতি প্রবলভাবে আপত্তি করেছিল। কিন্তু আমার জুলুমের কাছে নতি স্বীকার করতে হল ওদের।

মেরী আর ডায়না অবশ্য লণ্ডনেই আছে। পত্রযোগে তাদের সম্মতি আনিয়েছি আমি। স্নেহময়ী ভগিনীরা আমার! আমি তাদের বোন—এ সংবাদ শুনে তারা আহ্লাদে আটখানা। তারা এইবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি এসে পড়াশুনায় মন দিক। জীবিকার সমস্যা তো মিটে গিয়েছে!

সেণ্টজন আমাকে জিজ্ঞাসা করল—"স্কুলটার কি হবে?"

আমি বললাম—"কিছু অর্থ পেয়েছি বলেই যে আমি এক্ষুণি স্কুলের কাজ ছেড়ে চলে যাব, তা নয়। তুমি অন্য উপযুক্ত লোক দেখ। সে এলে তবে আমি এ কাজ ছাড়ব। ভাল লোক বাইরে থেকে আনতে কিছু বেশী মাইনে দিতে হবে অবশ্য। অতিরিক্ত অর্থটা আমরা চার ভাই-বোনে বহন করব।"

সেণ্টজন কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে।

মার্স-এণ্ড বাড়িটার আমূল সংস্কারের ভার নিলাম আমি। ঐ-খানেই আমরা তিন বোনে থাকব এখন থেকে। সেণ্টজনও থাকবে—যতদিন না সে ভারতবর্ষে চলে যায়। হ্যাঁ, ভারতবর্ষে সে যাবেই। ধর্মপ্রচারের যে ব্রত সে নিজের জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছে, তা থেকে কেউ বা কোন কিছুই তাকে বিচ্যুত করতে পারবে না। পারে নি মিস্ অলিভারের ভালবাসার আকর্ষণ। পারল না ধনৈশ্বর্যের আওতায় আয়েসী জীবনের প্রলোভন। সে যাবেই। তার অংশের পাঁচ হাজার পাউণ্ড সে তার ব্রত পালনের সুবিধার জন্যই ব্যয় করবে।

* * *

দিন কেটে যাচ্ছে। স্কুলের জন্য ভাল একজন শিক্ষিকা এসেছেন। আমি বিদায় নিয়ে এসেছি মর্টনের বিদ্যালয় থেকে। ছাত্রীরা তো বটেই, তাদের অভিভাবকেরাও সাশ্রুনেত্রে আমায় বিদায় দিয়েছে। অল্পদিনেই আমায় তারা আপনজন বলে ভেবে নিয়েছিল।

আমি সবাইকে বললাম—"মার্স-এণ্ড তো বেশী দূর নয়! সেখান থেকে মাঝে মাঝে আমি আসব স্কুল দেখতে।"

মার্স-এণ্ড সুসংস্কৃত হয়েছে। আমি গিয়ে সেখানে বাস করছি দাসী হানাকে নিয়ে। ডায়না আর মেরী এল লণ্ডন থেকে। সেণ্টজনও এখন প্রায়ই মার্স-এণ্ডে রাত্রি যাপন করে। মর্টন গির্জার কাজ চালাবার জন্য অন্য একজন যাজক পাওয়া গেলেই সে ভারতে যাত্রা করবে। লোক পেতে কয়েক মাস দেরি হতে পারে। এই সময়টার ভিতরে সেণ্টজন নিজেকে আরও ভালভাবে তৈরি করে নিচ্ছে। ভারত প্রবাসের উপযুক্ত হতে হলে হিন্দুস্থানী ভাষা ভালভাবে জানা দরকার। এর চর্চা সে আগেও করত। এখন এর উপর খুব বেশী জোর দিচ্ছে সে। একদিন আমাকে অনুরোধ করল—"তুমিও হিন্দুস্থানীটা শেখো না। দুজনে একসঙ্গে পড়লে পড়া ভাল হয়।"

তার অনুরোধে আমি রাজী হয়ে গেলাম, যদিও নিজের একটুও রুচি ছিল না ঐ বিজাতীয় শ্রুতিকটু ভাষার উপরে।

তারপর একদিন সেণ্টজন প্রস্তাব করল—"ভারতে গিয়ে ধর্মপ্রচার করব। দুজন একসঙ্গে গেলে কাজ করতে পারব ভাল। তুমিও আমার সঙ্গে চল।"

আমি আকাশ থেকে পড়লাম একেবারে। সে কি কথা? আমি যাব ভারতে?

আমি উড়িয়েই দিলাম কথাটা।

কিন্তু সেণ্টজন দমল না। বুঝলাম—সে এ নিয়ে অনেক চিন্তা করেছে। মাঝে মাঝেই সে কথাটা তুলতে লাগল। এমন আগ্রহ আর আকুলতার সঙ্গে তুলতে লাগল যে রীতিমত বিব্রত বোধ করতে লাগলাম আমি।

সে বলে—"এর চেয়ে মহান্ ব্রত মানুষের পক্ষে আর কী আছে? যে-সব অসভ্য অর্ধসভ্য নরনারী খ্রীষ্টধর্মের আলোক থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, তাদের কানে প্রভু যীশুর অমৃত বাণী পৌঁছে দেওয়া—এর চেয়ে পুণ্যকর্ম আর কী হতে পারে? আমি তো যাবই! কিন্তু একা পুরুষের কোন কাজই সর্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না। আমরা স্বামিস্ত্রী এক সাথে সে-কাজে আত্মনিয়োগ করলে—"

স্বামিস্ত্রী? আমি বজ্রাহত।

সেণ্টজন আমার অনুচ্চারিত প্রশ্নেরই উত্তর দেয়—"স্বামিস্ত্রী না হয়ে আমরা এক সঙ্গে যাব কেমন করে?"

নিজের মুহ্যমান অবস্থা জোর করে ঝেড়ে ফেলে আমি দৃঢ় স্বরে সেণ্টজনকে জানালাম—এ অসম্ভব। এ প্রস্তাব একেবারেই বাতুলতা।

কিন্তু আশ্চর্য, আমার কোন আপত্তিকেই সে আমল দেয় না। সে ধর্মোন্মাদ। তার ধারণা, তার পরিকল্পনার সম্মুখে যা-কিছু বাধা আসবে, তা আপনা থেকে দূর হয়ে যেতে বাধ্য। সে ধরেই নিয়েছে যে আমি শেষ পর্যন্ত রাজী হবই তার প্রস্তাবে। তার জোরের কথা শুনলে আমিও যেন কেমন দুর্বল হয়ে পড়ি—দৃঢ়প্রত্যয়ের সুরে নিজের বক্তব্য বলে উঠতে পারি না যেন।

দিনের পর দিন এইভাবে সে আমাকে খেলাতে লাগল, ঠিক যেমন করে মাছকে বঁড়শিতে গেঁথে শিকারী তাকে নিয়ে খেলায়। নির্মম! স্বার্থপর! বজ্রকঠিন!

আমি তার কথার প্রতিবাদ করে করে অবসন্ন হয়ে পড়লাম। মেরী বা ডায়নার সম্মুখে সেণ্টজন এসব কথা তোলে না। আমিও ওদের কিছু বলি নি এই অপ্রিয় ব্যাপারের কথা। কিন্তু ঘন ঘন সেণ্টজনকে আমার সঙ্গে গোপন আলোচনায় ব্যাপৃত দেখে ওরা সন্দেহ করল অবশেষে, এবং আমাকে জিজ্ঞাসাই করে বসল—ঘটনাটা কী।

আমি বললাম।

শুনে ওরা বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হল ভাইয়ের উপরে। এ কী নির্যাতন! ওরা আমাকে জোর গলায় বলল—"পাগলের কথায় কান দিও না। ওর পাল্লায় পড়লে তিন মাসও তুমি বাঁচবে না।"

বাঁচার জন্য তো আমি ব্যস্ত নই! আমার প্রধান আপত্তি এই যে আমি সেণ্টজনকে ভালবাসি না, এবং ভাল না বেসে বিবাহ করাকে আমি পাপ বলে মনে করি।

না, সেণ্টজনকে ভালবাসি না। এবং ভালবাসি এডওয়ার্ড রস্টারকে। জীবনে সেই আমার প্রথম এবং শেষ ভালবাসা। বার বার নতুন নতুন লোককে যারা ভালবাসতে পারে, আমি তাদের দলে নই। তাদের আমি ঘৃণা করি।

কিন্তু তবু সেণ্টজনের কথায় কী যে একটা দুর্জয় শক্তি আছে, যতক্ষণ সেকথা শুনি—আমি যেন সম্বিৎ হারিয়ে থাকি। অর্ধেক বাস্তব, অর্ধেক কল্পনায় তৈরী এক স্বপ্নের জগতে যেন বিচরণ করি আমি, যেখানে অসম্ভব আদর্শের পিছনে ছুটোছুটি করাকেই মনে হয় মহত্ত্ব। এমনি

ভাবে একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানে দাঁড়িয়ে তার কথা শুনছি আমি, তার যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মনে জাগলেও মুখে যোগাচ্ছে না, তার আবেগ যেন আমার কানের ভিতর দিয়ে অন্তরে সঞ্চারিত হয়ে নেশার মত আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে আমার চৈতন্যকে।

সে বার বার অনুরোধ করছে আমাকে—"তুমি বল, তুমি বল—প্রভু যীশুর সেবায় আত্মনিয়োগ করবার জন্য তুমি আমার জীবন-সঙ্গিনী হতে রাজী আছ।"

আমি কি সর্বগ্রাসী নেশার আবেশে সত্যি সত্যি বলতে যাচ্ছিলাম যে আমি রাজী আছি?

হয়ত সেই সর্বনাশই আমি করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি রক্ষা পেয়ে গেলাম। দৈবাৎ, আশ্চর্যভাবে। কোথা থেকে একটা দূরাগত আর্তনাদ আমার কানে ভেসে এল—"জেন! জেন! জেন আয়ার! কোথায় তুমি?" আমার চমক ভাঙল। এ স্বর তো আমার চেনা! আমি ছুটে গেলাম বাগানের সুদূর কোণের দিকে, যেখানে নিবিড় আঁধারে মর্মরধ্বনি উঠছে অদৃশ্য বৃক্ষশাখায়।

আমি ছুটে গেলাম, অমনিধারা আর্তনাদ আমারও মুখে—"এই যে আমি! আমি আসছি! আমি আসছি! কোথায় তুমি? ওগো, তুমি কোথায়?"

* * *

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি—রুদ্ধ দ্বারের নীচে দিয়ে কে একখানা কাগজ গলিয়ে দিয়ে গিয়েছে। উঠে গিয়ে কাগজখানা পড়লাম। সেণ্টজনেরই লেখা—

"জেন! কাল রাত্রে হঠাৎ কী হল তোমার? চেঁচিয়ে উঠে অন্ধকারের ভিতরে ছুটে গেলে, মেরী আর ডায়না দৌড়ে এল, আমি আর সেখানে দাঁড়ানো উচিত মনে করলাম না। মনে হয় স্নায়ুর উত্তেজনাই সে-উন্মাদনার কারণ। প্রভু যীশু তোমাকে শান্তি দিন!

আমি দুই হপ্তার জন্য কেম্‌ব্রিজে যাচ্ছি, মর্টন গির্জার ভার নেবেন যে ধর্মযাজক, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে আসবার জন্য। যাব যে, সে কথা তুমি আগেই শুনেছ, মেরী ডায়নাও শুনেছে। কালই মৌখিক তোমার কাছে বিদায় নিতাম, তুমি অমন করে ছুটে না পালালে। যাই হোক, পত্রে বিদায় নিচ্ছি। দুই হপ্তা পরে ফিরে

আসব। আশা করি ইতিমধ্যে তুমি মন স্থির করে ফেলতে পারবে। তোমাকে না পেলে আমার ব্রত উদ্‌যাপন কঠিন হবে। এবং তাতে আমার ক্ষতির চেয়ে বেশী ক্ষতি হবে প্রভু যীশুর। সে মহাপাপ তুমি করবে না, তা আমি জানি।—সেণ্টজন।"

চিঠি পড়ে আমার হাসি পেল। ব্রত-উদ্‌যাপন। ব্রত বুঝি একা সেণ্টজনেরই আছে? জেন আয়ারের বুঝি নেই? জেন আয়ারের ব্রত উদ্‌যাপিত না হলে প্রভু যীশুর বুঝি কোনই ক্ষতি হবে না? এডওয়ার্ড রস্টার বুঝি প্রভু যীশুর কেউ নয়? কাল সেই নৈশ সমীরণে ভেসে-আসা রহস্যময় আহ্বান শুনবার পরে আমার আর তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে প্রভু যীশু এই দুর্বলা নারীর উপরে একটি কর্তব্যই ন্যস্ত করেছেন। সে কর্তব্য হল তাঁরই আশ্রিত আর্ত অভাগা এডওয়ার্ড রস্টারকে সান্ত্বনা দান।

বাইরে বেরিয়েই শুনলাম—সেণ্টজন কেম্ব্রিজ রওনা হয়ে গিয়েছে। মনে মনে বললাম—"এইবার আমারও রওনা হওয়ার পালা।"

প্রাতরাশ সেরে নিজের ঘরে এসে বাক্সটা গুছিয়ে নিলাম। তার পরে মেরী আর ডায়নাকে গিয়ে বললাম—"বিশেষ প্রয়োজন আছে আমার। থর্নফিল্ড—যেখানে আমি আগে ছিলাম—সেখানে একবার যেতেই হবে। শীঘ্রই ফিরে আসব।"

তারা আমার স্বাধীন ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করবে কেন? "শীঘ্র এসো" —বলে আমায় বিদায় দিল। মনে মনে সংকল্প করলাম—ভাগ্যে আমার যাই ঘটুক না কেন, এই দুটি স্নেহময়ী ভগিনীর কাছ থেকে আমি কোনমতেই বিচ্ছিন্ন হব না।

হুইটক্রস পর্যন্ত এসে ডাকগাড়ি ধরলাম। ঠিক দশ মাস! দশ মাস আগে এই লাইনেরই একখানা ফিরতি গাড়ি আমাকে মিলকোট থেকে এখানে এনে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছিল কপর্দকশূন্য অবস্থায়। আজ আবার মিলকোটে যাচ্ছি—ভাগ্যের চাকা ঘুরেছে—আজ আমি পাঁচ হাজার পাউণ্ডের মালিক। গ্রাসাচ্ছাদনের উঞ্ছবৃত্তি করবার প্রয়োজন আর নেই।

যাচ্ছি মিস্টার রস্টারের কাছে। তাঁর কাতর আহ্বান ভেসে এসেছে সুদূর থেকে বাতাসে ভর করে। সে আহ্বানে সাড়া না দিলে সে হবে আমার নিষ্ঠুরতা। যাচ্ছি, কিন্তু ভবিষ্যৎ অতি অনিশ্চিত।

মিস্টার রস্টারের সঙ্গে মিলনে যে বাধা সেদিন ছিল, সে তো এখনও রয়েছে নিশ্চয়ই! তবে আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াব কোন্ সাহসে? কোন্ দাবি নিয়ে?

এ প্রশ্নের কোন জবাব আমার মাথায় আসছে না। পালিয়ে আসার প্রেরণা সেদিন যিনি দিয়েছিলেন, ফিরে যাওয়ার প্রেরণাও আজ তিনিই দিয়েছেন। আমি সেদিনও তাঁর নির্দেশ মাথায় তুলে নিয়েছিলাম, আজও তাই নিলাম। গ্রন্থিমোচনের ভার তাঁর উপরে। আবার যে নির্দেশ যখন পাব, মর্মান্তিক যাতনা সহ্য করেও তা পালন করতে পারি যেন, এই মাত্র মিনতি তাঁর পায়ে।

মিলকোটে এসে গাড়ি থেকে নামলাম। এখানে একটা হোটেল আছে, আগেও জানতাম। 'রস্টার আর্ম্‌স' নাম তার। সেইখানে সামান্য কিছু খেয়ে নিলাম, তারপরে বাক্সটা সেইখানে রেখে পায়ে হেঁটে রওনা হলাম মাঠের ভিতর দিয়ে। থর্নফিল্ড এখান থেকে দুই মাইল হবে।

অনেকবার আগ্রহ হয়েছিল—হোটেলওয়ালাকে মিস্টার রস্টারের খবর জিজ্ঞাসা করি। আগ্রহ দমন করেছি। কী জানি কী শুনতে হয়! যা জানবার আছে, নিজে গিয়েই জানব। কানে বাজছে মিস্টার রস্টারের সেই আকুল আর্তনাদ—"জেন! জেন! জেন আয়ার!" —কী-জানি তাঁর কী হল!

মাঠ পেরিয়ে চলেছি। প্রথম দিকে দ্রুত চলেছিলাম। যত থর্নফিল্ডের নিকটে আসছি, গতি ততই মন্থর হচ্ছে। কী জানি কী দেখব! একটা অজানা আশঙ্কায় অন্তর দমে যাচ্ছে বড়।

ঐ যে! ঐ ছোট্ট বনটা পেরুলেই থর্নফিল্ডের প্রাসাদ চোখে পড়বে। এগিয়ে যাই, বুকটা দুই হাতে চেপে ধরে।

কই? কোথায় থর্নফিল্ড?

নেই, থর্নফিল্ডের প্রাসাদের কোন অস্তিত্বই নেই। পড়ে আছে একটা ভস্মস্তূপ! পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে সেই সুবিশাল বিলাসকেন্দ্র!

এগারো

হতচেতনের মত দাঁড়িয়েছিলাম সেই বনের ধারে—কতক্ষণ তা জানি না।

শেষকালে ধীরে ধীরে পা টেনে টেনে এগিয়ে গেলাম সেই ভস্ম-স্তূপের দিকে। কাছে গিয়ে দেখলাম, আগাগোড়া বাড়িটাই ধ্বংস হয়েছে। ছাদ ভেঙে পড়েছে, দেয়াল ধ্বসে পড়েছে। সব কালোয় কালো।

একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—ধ্বংসস্তূপের উপর লতা গজিয়েছে, শেওলায় সবুজ হয়ে গিয়েছে,—ভেঙে-পড়া ইট পাথর। অর্থাৎ অগ্নি-দাহের ব্যাপারটা ঘটেছিল বেশ কিছুদিন আগে। হয়ত আমি থর্নফিল্ড ত্যাগ করে যাওয়ার পরেই।

আচ্ছন্নের মত ঘুরে বেড়াচ্ছি সেই পোড়া কয়লার গাদার ভিতরে। থর্নফিল্ড নেই। থর্নফিল্ডের মালিকও কি নেই? তিনিও কি পুড়ে মরেছেন? তাঁর দেহভস্ম কি মিশে আছে এই জমাট-বাঁধা ছাইগাদার ভিতর? অসহ্য যন্ত্রণায় বুকটা ধড়ফড় করে। দুই হাতে চেপে ধরি বুক।

বেলা প্রায় দুপুর। মাথার উপর কোন আচ্ছাদন নেই! তপ্ত বায়ু হা-হা করছে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে। দেহে মনে একটা সর্বগ্রাসী অবসাদ।

কখন পায়ে পায়ে ফিরতে শুরু করেছি মিলকোটের দিকে, টের পাইনি। হুঁশ হল হোটেলের সম্মুখে এসে। তখন ফিরে এল দায়িত্ববোধ। মুষড়ে পড়লে চলবে না। খোঁজ নিতে হবে। মিস্টার রস্টারের কী হল, জানতে হবে।

কিছু খেয়ে নেবার জন্য হোটেলে গিয়ে বসলাম। সেই সুযোগে আলাপ জমিয়ে নিলাম হোটেলওয়ালার সঙ্গে। ওর হোটেলের নাম রস্টার আর্মস্, সেই সূত্র ধরে রস্টার পরিবারের প্রসঙ্গে এসে পড়লাম, তা থেকে ক্রমে মিস্টার রস্টারের ব্যক্তিগত কাহিনীতে। আমি যে

থর্নফিল্ডে গিয়েছিলাম, সেকথা প্রকাশ না করেও অগ্নিকাণ্ডের ইতিহাসটা ওর মুখ থেকে জেনে নেওয়া শক্ত হল না। সে ইতিহাস ওর ভাষাতেই বলি—

"মিস্টার রস্টার খেয়ালী লোক ছিলেন মাদাম! কোথায় কালা-পানির ওপারে গিয়ে কবে নাকি বিয়ে করেছিলেন। বরাতগুণে সে বউ গেল পাগল হয়ে, উদ্দাম পাগল একেবারে। উনি তাকে থর্নফিল্ডে এনে রাখলেন, কিন্তু অতি গোপনে। বাড়ির লোক ছাড়া কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি ঐ পাগলীর অস্তিত্বের কথা। আর বাড়ির লোকের উপরেও এমনি কড়া শাসন ছিল যে কেউ কোনদিন বাইরে ও-কথা প্রকাশ করেনি।

"এখন হল কী জানেন মাদাম, ঐ পাগলীর একদিন কী হল কে জানে—দুপুর রাতে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিল। তেতলার ছাদে কয়েকখানা হালকা ঘর ছিল, তাতে ইটের চাইতে কাঠেরই পরিমাণ বেশী, সেইগুলোই জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে।

"ঘুম থেকে উঠেই মিস্টার রস্টার প্রথমে ছুটলেন সেই জ্বলন্ত আগুনঘেরা ছাদে, পাগলীকে সেই অগ্নিকুণ্ড থেকে বার করে আনবার জন্য। 'বার্থা' বলে তাকে ডাক দিতেই পাগলী ছুটে পালাবার চেষ্টা করল, আর টাল খেয়ে পড়ল গিয়ে একেবারে সেই আগুনের ভিতরে। সেখান থেকে তাকে টেনে বার করার চেষ্টা করতে গিয়ে মিস্টার রস্টারের আধখানা কপাল পুড়ে গেল, একটি চোখ সমেত। আর একটা চোখও পুড়ে না যাক—ঝলসে গিয়েছে, তাতেও আর দৃষ্টি-শক্তি নেই।"

"তিনি বেঁচে আছেন তাহলে?"—প্রশ্নটা করলাম হাঁপাতে হাঁপাতে।

"যেভাবে আছেন, সে না-থাকারই সমান। শুধু অন্ধ হয়েছেন, তাই নয়। বাঁ হাতখানিও গিয়েছে। হাতড়াতে হাতড়াতে নেমে আসছেন যখন, সিঁড়িটা জ্বলতে জ্বলতে ভেঙে পড়ল। উনি পড়লেন তেতলা থেকে একতলায়। হাতখানা ভেঙে গেল। কেটে বাদ দিতে হয়েছে।"

"তিনি কোথায় এখন?"

"ওঁর আর একটা বাড়ি আছে, ফার্নডিন ম্যানর। এখান থেকে

পাঁচ ছয় মাইল। ভাঙা-চোরা বাড়ি, বনের ভিতর। সেইখানে আছেন একটি চাকর, একটি দাসী আর একটি কুকুর নিয়ে। অন্য দাসদাসীদের বিদায় দিয়েছেন। বাড়ির গিন্নী ছিলেন মিসেস্ ফেয়ারফ্যাক্স, তাঁকে মাসিক ভাতা বরাদ্দ করে দিয়ে নিজের বাড়িতে পাঠিয়েছেন, আদেলি বলে একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল সংসারে, তাকে পাঠিয়েছেন কোথায় এক স্কুলে—মোটের উপর ঐ যে বললাম, যেভাবে বেঁচে আছেন, তাকে না-বাঁচার সামিলই বলা যায়।"

* * *

ফার্নডিন! নামটা শুনেছিলাম মিস্টার রস্টারের মুখে। বনের ভিতর অস্বাস্থ্যকর জায়গা। দুই তিন মাইলের ভিতর অন্য লোকালয় নেই। শিকার করবার জন্য মিস্টার রস্টার বছরে দুই একবার সেখানে যেতেন, থাকতেন দুই চার দিন। সেইজন্য খান তিনেক ঘর মেরামত করে বাসযোগ্য অবস্থায় রাখা হত, বাকী সব ঘর পরিত্যক্ত হয়ে আছে বহু দিন থেকে, ভেঙেচুরে পড়ছে। ভাড়া দেবার চেষ্টা করেও ভাড়াটে পাননি মিস্টার রস্টার, ওটা লোকসানের সম্পত্তি বলেই গণ্য হয়ে আসছিল।

সেই ফার্নডিনে অবশেষে স্থায়ীভাবে তাঁকে বাস করতে হয়েছে। স্বাস্থ্য কি তাতে ভেঙে পড়ে নি?

হোটেলওয়ালাকে দিয়েই একখানা গাড়ি যোগাড় করেছি। সেই গাড়িতে চড়ে ফার্নডিনে চলেছি। সন্ধ্যার আগে পৌঁছাতে পারলে ডবল বকশিশ দেব—চালককে এই লোভ দেখিয়েছি। মেঠো ঘোড়াটাকে সে একবার পিটছে, একবার খোসামোদ করছে।

ভাবছি। বার্থা নেই। মিস্টার রস্টারের সঙ্গে আমার মিলনেরও বাধা নেই আর। মিস্টার রস্টার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছেন, দুটি চোখ আর একখানি হাত বিসর্জন দিয়ে। সেই দুর্দান্ত পুরুষ কীভাবে এখন অসহায় পঙ্গু জীবন যাপন করছেন, ভাবতে গিয়েই শিউরে উঠছি বারবার।

রাস্তার ধারে একটা লোহার গেট। চালক বলল—ঐখানেই নামতে হবে। গেট থেকেই ফার্নডিনের এলাকা শুরু। ভিতর দিকে একটা রাস্তা চলে গিয়েছে, কিন্তু সেটা ঘাসে আর আগাছায় ঢাকা,

পাশের বড় বড় গাছের ডাল এভাবে মাথার উপর ঝুলে পড়েছে যে গাড়ি চলবে না সে-পথে।

নামতে হল। ডবল বকশিশই দিলাম, কারণ এখনও একটু বেলা রয়েছে। বাক্সটা গেটের ভিতর টেনে এনে সংলগ্ন ভাঙ্গা ঘরের ভিতরে রেখে দিলাম। তার পর বনপথ ধরে এগুতে থাকলাম।

গাড়ি চলবার মতই রাস্তা ছিল এক কালে। কিন্তু এখন মানুষে চলাই শক্ত। দস্তুরমত জঙ্গল। এইমাত্র বাইরে রৌদ্র দেখে এলাম, কিন্তু এখানে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে এরই মধ্যে। বৃষ্টি হয়েছিল কখন। এখনও গাছের পাতা থেকে জল ঝরছে টুপুর টাপুর করে।

বনের পথ আর শেষ হতেই চায় না যেন। কত জমি এই ফার্নডিন ম্যানরের হাতায়।

অবশেষে গাছপালা হালকা হয়ে এল। খানিকটা খোলা জায়গা দেখা গেল, তার চারিধারে নুড়ি পাথর দিয়ে বাঁধানো রাস্তা। এখানটায় এখনও দিনের আলো। সমুখেই বাড়ি। সদর দরজার উপর দোতলা ছাদ। সিঁড়িতে একটি মাত্র ধাপ।

এমন বে-মেরামত রং-চটা চেহারা বাড়িখানার! মনে বিতৃষ্ণা আসতে যাচ্ছিল, জোর করে তাড়ালাম সে বিতৃষ্ণাকে। মনকে বোঝলাম—এ বাড়ির মালিককেও তো এমনি বে-মেরামত বিবর্ণ অবস্থায় দেখতে পাব এক্ষুণি। তাঁর উপরেও কি এমনি ধারা বিতৃষ্ণা আসবে না কি? এমন চপল মন আমার? তা হলে কষ্ট করে এলাম কেন এখানে?

দরজা নিঃশব্দে খুলে একটি লোক বেরুলো। একটি মাত্র ধাপের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল খোলা উঠানে। ডান হাত বাড়িয়ে এধারে ওধারে অবলম্বন খুঁজল কিছুক্ষণ। পেল না কিছুই। তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল দৃষ্টিহীন চোখ আকাশপানে তুলে।

চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হয় নি। বজ্রদগ্ধ বনস্পতি। মিস্টার রস্টার অথবা পৌরুষদীপ্ত রস্টারের কঙ্কাল মাত্র। করুণায় মন ভরে যায় সেই তেজীয়ান মূর্তির এই পরিণতি দেখে।

আকুল আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে উঠলাম—ছুটে গিয়ে তাঁর হাত ধরবার জন্য। কিন্তু সংযত করলাম নিজেকে। ধীরে! দশ মাস দেরি সহ্য হয়েছে তো আর দশ মিনিটও সইবে।

ভিতর থেকে আর একজন এল। এ হল জন, ওঁর ভৃত্য।

জন বলল—"কর্তা, বৃষ্টি পড়ছে, ভিতরে আসুন।"

"না, এখন নয়"—বিরক্ত স্বরে উত্তর।

জন আর কিছু বলতে সাহস পেল না, নিঃশব্দে ভিতরে গেল।

মিস্টার রস্টার দাঁড়িয়ে রইলেন গোধূলির বিষণ্ণ আলোকে, তেমনি করে দৃষ্টিহীন চোখ আকাশপানে তুলে। কী নৈরাশ্য সেই দাঁড়াবার ভঙ্গিমায়!

কিন্তু বৃষ্টিটা খুবই চেপে নামল। উনি ভিতরে যেতে বাধ্য হলেন। আমিও গিয়ে রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে পড়লাম, দরজা খোলাই ছিল।

ভিতর পানে টুলে বসে জন চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে, দরজার ধারেই মেরী যেন কী-সব রান্নাবান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। আমায় দেখে ওরা দুজন যেন ভূত-দেখার মত আঁতকে উঠল—"সে কী! এই ভর সন্ধ্যেবেলায় বৃষ্টি মাথায় করে এই জঙ্গলের ভিতর এ কি সত্যিই আপনি, মিস্ আয়ার?

"হ্যাঁ গো, সত্যিই আমি বইকি! একবার মিস্টার রস্টারকে দেখতে এলাম! রাত্তিরটা এখানে থাকতে পারব তো?"

মাথা চুলকে জন বলল—"তেমন ঘর বা বিছানাপত্র সত্যিই নেই। তা যা-হোক করে হয়ে যাবে এখন। রাত্তির বেলায় আপনি আর যাবেন বা কোথায়?"

আমি তাদের ধন্যবাদ দিয়ে জনকে পাঠিয়ে দিলাম গেটের ঘর থেকে আমার বাক্সটা নিয়ে আসবার জন্য। সে চলে গেলে মেরীকে জিজ্ঞাসা করলাম—"মিস্টার রস্টার কেমন আছেন, বল!" আমি একটু আগেই তাঁকে চাক্ষুষ দেখেছি, সেটা চেপে গেলাম।

মেরী উত্তর দিল—"আর থাকা-থাকি! জ্যান্তে মরা, মিস্, জ্যান্তে মরা। দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না যে এ সেই মানুষ। দুটি চক্ষু গেছে, বাঁ হাতও গেছে। আর গেছে জীবনের সব আনন্দ। রাত্রিদিন চুপচাপ বসে আছেন, আর বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন। কারও সঙ্গে দেখা করেন না, আমার বা জনের সঙ্গেও কথা বলেন কদাচিৎ কখনো।"

"আমি যে একবার দেখা করবই"—

বলতে বলতে মিস্টার রস্টারের ঘরের ঘণ্টা বাজল। মেরীকে বললাম —"আমার নাম বলো না, শুধু বলবে একজন লোক দেখা করতে চায়।"

মেরী ফিরে এসে বলল—"নাম জানতে চাইলেন। আগেই তো বলেছিলাম আপনাকে! নাম পাঠালেও দেখা করবেন বলে আশা নেই।"

বলতে বলতে সে গেলাসে জল ঢালছে।

"জল চাইলেন না কি ?"—জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

"হ্যাঁ, সেই জন্যই ডেকেছিলেন।" বলে ট্রের উপর গেলাস বসাল। মেরীর হাত থেকে ট্রে আমি কেড়ে নিলাম—"দাও, আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

মেরী আপত্তি না করলেও তার মুখ দেখে বুঝলাম—ব্যবস্থাটা সে পছন্দ করে নি। মনিব রেগে যাবেন—তাতে তার সন্দেহ নেই।

আমি ও ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। পা কাঁপছে, বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করছে এত জোরে—

ঘরের এক কোণে পাইলট কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। আমার শব্দ পেয়েই কান খাড়া করল। তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে আমার উপর, মুখে তার অভিমানের কুঁই কুঁই কান্না!

মিস্টার রস্টারও কান খাড়া করেছেন—মেরীকে দেখে তো এ-রকম করার কথা নয় পাইলটের! কিন্তু আর আসবেই বা কে ? সন্দেহের স্বরে বললেন—"মেরী না ?"

আমি জলের গেলাসটা হাতে দিলাম তাঁর—হাতটা কেঁপে গেল, জলও পড়ে গেল চলকে। পাইলট তখনও আমার চারদিকে ঘুরে ঘুরে লাফাচ্ছে। বাধ্য হয়ে নীচুগলায় তাকে বললাম—"পাইলট! চুপ!"

"কে ? কে ?" চমকে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি—এত দিনেও আমার কণ্ঠস্বর তিনি ভোলেন নি।

"জলটা পড়ে গেল। আর এক গেলাস আনব ?"—আমি ধরা গলায় প্রশ্ন করলাম।

আর জল! "কে তুমি ? কে তুমি ? অশরীরী জেন ? সেদিনকার মত আবার ছলনা করতে এসেছ ? তা এসো! ছলনা করে আনন্দ পাও যদি, তাই কর। কিন্তু চলে যেও না। হে আমার কামনার ধন—কণ্ঠস্বর বল, আর দুটো কথা বল। চলে যেও না সেদিনকার মত।"

"কোন্ দিনকার মত ?" আমি জিজ্ঞাসা করি সংশয়ে সন্দেহে। মাথা ঠিক আছে তো ওঁর ?

"সেই যে! সোমবার রাত্রে!" আমি সেদিন আর অন্তরের কান্না চাপতে পারিনি! রাতের বেলায় শোবার ঘরের জানালায় বসে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম—'জেন, জেন, জেন আয়ার' বলে। সঙ্গে সঙ্গে তোমার এই কণ্ঠস্বরে জবাব পেলাম অনেক দূর থেকে যেন—'এই যে। এই যে আমি! আমি আসছি! কোথায় তুমি? তুমি কোথায়?'

সোমবার রাত্রে? আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ভগবানের লীলা ছাড়া আর কী! মিস্টার রস্টারের কথাও আমি যেমন শুনতে পেয়েছিলাম সেদিন, আমার কথাও উনি তেমনিই শুনতে পেয়েছিলেন।

অনুযোগের সুরে কাতর কণ্ঠে তিনি বললেন—"আসছি মানে কি দুটি কথা মাত্র পৌঁছে দেওয়া? তোমায় কাছে পাওয়ার জন্য যখন সমস্ত অন্তর উদ্গ্রীব হয়ে আছে—জেন! জেন। চলে গেলে না কি? আমি বেশী কিছু চাইব না। শুধু কণ্ঠস্বর হয়েই তুমি থাকো একটুখানি! জেন! চলে গেলে?"

"না, যাই নি! যাব না"—বলতে বলতে আমি তাঁর হাতে হাত রাখলাম—আকুল হয়ে যে হাতখানি প্রসারিত করে তিনি বাতাস আঁকড়ে ধরছিলেন।

"হাত? জেন? তোমার হাত? এই তো সেই চাঁপাকলির মত সরু সরু আঙ্গুলগুলি চোখে দেখতে না পেলেও এর স্পর্শ তো আমি ভুলি নি! জেন! এ কি প্রহেলিকা। হাত যদি থাকে, তুমিও আছ। কই? কোথায়?"

পরক্ষণে তিনি টেনে আমায় কাছে নিয়ে এলেন—"জেন? সত্যিই তুমি? তুমি মরে যাও নি? এক বস্ত্রে কানাকড়ি হাতে না নিয়ে দুনিয়ার পথে বেরিয়েও তুমি বেঁচে ফিরে এসেছ? এসে থাকো যদি, আর যেয়ো না! আর যেয়ো না জেন! আর যেয়ো না।"

না, আমি আর যাই নি। তিন দিন বাদেই তাঁকে বিবাহ করলাম আমি।

শেষ